মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৬, সংখ্যা-০২

মার্চ ২০১৭ ইং, জুমাদাল উখরা ১৪৩৮ হি., ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

جمادى الاخرى ١٤٣٨ھ،مارس ٢٠١٧م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮

ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com

www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল

মুফতী আব্দুস সালাম

মাওলানা হারুন

মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৭.... ৪

হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৮

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

ক্ষমা করা মহৎ গুণ...................................... ৯

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে কালিমায়ে তায়্যিবাহ......... ১১

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

নমুনায়ে আসলাফ হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.).......... ১৩

মূল : মুফতী আবুল কাসেম নুমানী

উচ্চারণভেদে তালাক................................... ১৭

মুফতী শরীফুল আজম

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৯.......................... ২১

মাওলানা কাসেম শরীফ

নববী ইলম অর্জনের ফজীলত ও পাথেয় ২৬

মুফতী আশহাদ রশীদী

মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা

ইসলামী শরীয়ত কী বলে............................. ৩২

মুফতী নূর মুহাম্মদ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪০

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৯ .... ৪৫

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

নৈতিকতাই দেশ-জাতির উন্নতির সোপান

নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ-সভ্যতা দেশ ও জাতির উন্নয়ন-উৎকর্ষতার মহাসোপান। প্রতিটি দেশ ও জাতির কিছু নির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ রয়েছে। ওই ভিত্তিতেই দেশ-জাতির ক্রমবিকাশ ঘটে। নৈতিকতা বিবর্জিত অবস্থায় জাতি ও দেশকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। এমন জাতির উন্নতি ও উত্থানের তো প্রশ্নই আসে না বরং উপনীত হতে হয় অস্তিত্বের লড়াইয়ে।

নীতি-আদর্শ দুই ভাবেই নির্ণিত হয়ে থাকে। এক ধরনের নীতি-আদর্শ হলো ঐশী সূত্রে পাওয়া, যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত। মানব ইতিহাসে অসংখ্য নবী-রাসূল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। যুগ যুগ ধরে এই ঐশী নীতি-আদর্শ বিভিন্ন উম্মত ও জাতিগোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, সভ্য সমাজের ভিত রচিত হয়েছে। ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে মানব জীবনের সকল স্তর এর ভিত্তিতেই একসময় পরিচালিত হয়েছে।

আরেকটি হলো, যা মানুষ নিজ পারিপার্শিক অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও গণমানুষের সংখ্যা, মেজাজ এবং সুবিধানুকূল্যে আবিষ্কার করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় দেশই সেরূপ মানব রচিত নীতি-আদর্শের ওপরই পরিচালিত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে নব আবিষ্কৃত এসব নীতি-আদর্শও যে মানুষ মায়ের পেট থেকে শিখে এসেই প্রণয়ন করেছে, তা নয়। আবার আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিও এসবের প্রণেতা নয়। বরং এর প্রায় ক্ষেত্রে পূর্বাপরের বিভিন্ন ঐশী নীতি-আদর্শের প্রভাব ব্যাপকভাবেই বিদ্যমান। যদিও মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এসব নীতি-আদর্শ সর্বজনীনও নয়, আবার সর্বকালের জন্য সংবেদনশীলও নয়।

তার পরও যে দেশে যে নীতি-আদর্শ ও আইন প্রণীত আছে, তা যদি আপন গতিতে প্রয়োগ এবং বাস্তবায়িত হতে পারত তবে পার্থিবভাবে মানব সমাজে দুর্দশা আরো অনেকখানিই হ্রাস পেত।

কিন্তু না। দৈনন্দিন বিশ্ব পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে। মারমুখী হয়ে উঠছে পুরো মানবতা। কী ঐশী নীতি, কী রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, কিইবা মানবীয় নীতি-আদর্শ। মানুষ যেন নিজেদের সব কিছুরই ঊর্ধ্বে মনে করছে। একজন ঠকাতে চায় একশজনকে। একশজন চায় একজনকে পিষে ফেলতে। মানব পরিমণ্ডলে যেন মানবতার হাহাকার।

এমন কোনো জাতিগোষ্ঠী নেই, যাদের মাঝে মিথ্যা, জোর-জুলুম, খুন, চুরি-ডাকাতি, দুর্নীতি-সন্ত্রাস ইত্যাদি নিন্দনীয় নয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে মানুষই আবার এর সম্মুখীন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর হুঙ্কার ছাড়ছে। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার সমূহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মিথ্যার ছড়াছড়ির কথা বলাই বাহুল্য। সন্ত্রাসবাদ ও খুন-খারাবি যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অংশে পরিণত হচ্ছে। মানুষ হয়ে উঠছে অন্যের ক্ষতিসাধনে অত্যন্ত কুশলী।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ এবং জাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান এই দেশে। নীতি-আদর্শ পরিপালনে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র থেকে এগিয়ে এ দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ। এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী। ধর্মীয় বিধানাবলি পালনকারী। ৯০ শতাংশ মানুষই মুসলমান। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন তো আছেই। মজবুত বিচার বিভাগ ও প্রশাসন আছে এই দেশে। সামাজিক অনেক বাধ্যবাধকতা এবং সতর্কতার মাঝে এ দেশের মানুষ বেড়ে ওঠে। কিন্তু এতগুলো গণ্ডি অতিক্রম করেও অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি এ দেশের মানুষের বিবেচনায়ও সর্বোচ্চ অপরাধ। দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-রাহাজানি–সবই এই দেশের আইন-কানুনসহ সর্ব বিবেচনায় গর্হিত কাজ। কিন্তু এসব অহরহই ঘটছে। অধিকন্তু এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়েও সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন আছে। কিন্তু দেখা যায়, সংখ্যালঘুর অধিকার বাস্তবায়নের নামে অনেকে সংখ্যাগরিষ্ঠকেও পিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দিকে লক্ষ রেখে এ দেশের পাঠ্য বইসমূহে হাতেগোনা কয়েকটি ইসলামী প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছিল। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সেগুলোকে বাদ দিয়ে তাতে ভিন্ন ধর্মীয় প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস চালান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তিনি এই মানসিকতায় চরম আঘাত হেনেছেন। পাঠ্য বইসমূহে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। যদিও কতিপয় হীনমন্য বুদ্ধিজীবী তাতে রাজি হতে পারেননি। মূর্তি, প্রাণীর অপ্রয়োজনীয় ছবি, ভিডিও মুসলমানদের সংস্কৃতি নয়। বরং মুসলমানদের বেলায় এসব চরম গর্হিত কাজ। আবার তা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীকও বটে। এখন মূর্তি স্থাপন নিয়ে চলছে নানা পরিকল্পনা। মুসলমানদের সাথে মূর্তির ব্যাপারে পার্থিব কারণে কোনো বৈরিতা নেই। বরং ইসলামী শরীয়তসহ সমস্ত ঐশী বিধানে মূর্তি পূজা, মূর্তি রাখা, বানানো সবচেয়ে বেশি গর্হিত কাজ। পরকালে সর্বাধিক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে মূর্তি সংস্কৃতির জন্য। সে কারণেই মুসলমান মাত্রই মূর্তি সংস্কৃতিকে স্বাগত জানাতে পারে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইলে মুসলমানদের এরূপ গর্হিত কাজ হতে সহজে রক্ষা করতে পারেন।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিয়ম-দুর্নীতি, যুবসমাজ কর্তৃক নীতি-আদর্শের শৃঙ্খল ভাঙার ভয়ংকর বাস্তবতা, বেহায়াপনা-নোংরামির ভয়ানক চর্চা, পরিবার থেকে আরম্ভ করে সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রীয় গণ্ডিতে অনিয়ম-দূরাচারের প্রাদুর্ভাব আজ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! যার কারণেই মূলত শান্তির নীড় অশান্তির নরকে পরিণত হচ্ছে। প্রত্যেক আদর্শে সামষ্টিকভাবে যেসব বিষয় গর্হিত, পাপ বা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, সেসব বিষয়গুলোর বাস্তবায়নই যেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গীতে পরিণত হচ্ছে। এরূপ অবস্থা দেশ-জাতি এবং সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অবক্ষয়। ধ্বংসের চূড়ান্ত হাতছানি। তাই আমরা যে ধর্মের, যে বর্ণের এবং যে দলেরই হই না কেন, নীতি-আদর্শের শক্তিশালী প্রাচীরকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করি। কোথাও ছিদ্র হয়ে গেলে তা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার প্রয়াসী হই। এবারের স্বাধীনতার মাসে দেশের স্বাধীনতা, ঐতিহ্য এবং শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার মানসে এই প্রতিজ্ঞাই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ পথচলা।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৭/০২/২০১৭ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু; এগুলি ব্যতীত যা তোমাদের শোনানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তির অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন হতে। (হজ ৩০)

যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করবে, অর্থাৎ গোনাহ ও হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার জন্য আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান রয়েছে। ভালো কাজ করলে যেমন পুরস্কার আছে, তেমনি মন্দ কাজ হতে বিরত থাকলেও পুণ্য রয়েছে। হজ ও উমরা আল্লাহ নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলি হালাল। তবে যেগুলি হারাম, সেগুলি তোমাদের সামনে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

অর্থাৎ তোমরা পরিহার করো অপবিত্র বস্তু–মূর্তিসমূহ এবং মিথ্যা কথন হতে দূরে থাকো।

পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান এবং বিধিনিষেধের ওপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহিত করার পর আয়াতের এই অংশে নোংরা ও অপবিত্র বস্তু পরিহারের কথা বলেছেন। এর মধ্যে বিশেষ করে মূর্তি এবং মিথ্যা কথা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে মূর্তি, ভাস্কর্য, প্রাণীর ছবি, ভিডিও সবই হারাম :

মূর্তি পূজা যেমন স্পষ্ট শিরিক, তেমনি মূর্তি, ভাস্কর্য, প্রাণীর ছবি, ভিডিও নির্মাণ, ব্যবহার, সংরক্ষণ সবই কবীরা গোনাহ-হারাম। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য নির্দেশনাবলি থেকে এসব বিধান সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট।

পবিত্র কোরআনের এক আয়াতে এসেছে–

وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا

'আর তারা বলেছিল, তোমরা পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদের এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়াকে, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে। অথচ এগুলো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। (নূহ : ২৩-২৪)

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا

তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে উপাসনা করো (অসার) মূর্তির এবং তোমরা নির্মাণ করো মিথ্যা। (আনকাবুত : ১৭)

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে–

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলার এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে। (মুসলিম শরীফ, হা. ৮৩২)

আরেক হাদীসে এসেছে–

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) আবুল হায়্যাজ আসাদীকে বলেন, আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধিসৌধ ভূমিসাৎ করে দেবে। 'অন্য বর্ণনায় এসেছে,... এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে। (মুসলিম শরীফ, হা. ৯৬৯)

আরেক হাদীসে এসেছে–

প্রতিকৃতি তৈরিকারীরা (চিত্রকর) হলো ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। (বুখারী শরীফ, হা. ৫৯৫০)

অন্য হাদীসে এসেছে–

ওই লোকের চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে। তাদের যদি সামর্থ্য থাকে তবে তারা সৃজন করুক একটি কণা এবং একটি শস্য কিংবা একটি যব! (বোখারী শরীফ, হা. ৫৯৫৩)

আরেক হাদীসে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী, উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারী তথা ভাস্কর, চিত্রকরদের ওপর লানত করেছেন। (বোখারী শরীফ, হা. ৫৯৬২)

এরূপ অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে মূর্তি, ভাস্কর্য, ছবি, ভিডিও ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাই মুসলমানদের উচিত, একেন্দ্রিক সকল কাজ পরিহার করা, সকল অপসংস্কৃতি বর্জন করা।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৭

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

হাদীস নং-০৬

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِى أُمَامَةَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ :غَسَلَ يَدَيْهِ، وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلاهُ، وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ سُوءٍ "قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِيهِ

হযরত আবু মুসলিম (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু উমামা (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। আমি আরজ করলাম যে আমার নিকট এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে আপনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট হতে এই ইরশাদ শুনেছেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওজু করে অতঃপর ফরয নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার ওই দিনের ওই সমস্ত গোনাহ, যা চলাফেরার দ্বারা হয়েছে, যা হাতের দ্বারা করেছে, যা কানের দ্বারা হয়েছে, যা চক্ষু দ্বারা করেছে এবং ওই সমস্ত গোনাহ, যেগুলোর খেয়াল তার অন্তরে পয়দা হয়েছে সবই মাফ করে দেন। হযরত উমামা (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম আমি এই কথা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হতে কয়েকবার শুনেছি।

(মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৩ হা. ২২৩৫, আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী] হা. ৮০৩২, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা. ১৭৪৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩৬৯, আল ইতহাফ হা. ৭৫৫)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. হযরত উসমান (রা.)-এর একটি রেওয়ায়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই ইরশাদও বর্ণনা করা হয়েছে, কেউ যেন (নামায দ্বারা গোনাহ মাফ হয়ে যায়) এই কথার দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে যায়।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ، قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى هَذَا الْمَجْلِسِ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ :وَقَالَ :مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِى هَذَا، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا تَغْتَرُّوا

(বুখারী শরীফ ৭/২২৪ হা. ৬৪৩৩, মুসনাদে আহমদ ১/৬৬ হা. ৪৮০, মুশকিলুল আসার [তাহাবী] ৩/১৯৯, কানযুল উম্মাল হা. ২৬৮৯৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৭ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ,حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ,حَدَّثَنَا أَبُو

دুজন সাথীও সেখানে আছেন। এমন সময় ভেতর হতে এক ব্যক্তি এসে ওই ব্যক্তিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল, যিনি এক বছর পর ইন্তেকাল করেছেন আর শহীদ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ভেতর হতে একজন এসে শহীদ ব্যক্তিকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিল। আর আমাকে বলল, তোমার এখনও সময় হয়নি। তুমি ফিরে যাও। পরদিন সকালে আমি লোকজনের নিকট স্বপ্নের আলোচনা করলাম। সকলেই এতে আশ্চর্য হলো যে শহীদের অনুমতি পরে হলো কেন? তার তো আগেই অনুমতি পাওয়া উচিত ছিল। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বিষয়টি আরজ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! লোকেরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে অত্যন্ত উদ্যমী সাহসী লোক ছিল এবং সে শহীদও হয়েছে, অথচ অপরজন জান্নাতে তার আগে প্রবেশ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আগে প্রবেশ করেছে সে কি এক বছরের ইবাদত বেশি করেনি? সকলে বললেন, নিশ্চয়ই করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বললেন, সে কি পুরো এক রমাজান রোযা বেশি রাখেনি? সকলে বললেন, নিশ্চয়ই রেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেন, সে কি এক বছর নামাযের মধ্যে এতো এতো সিজদা বেশি করেনি? সকলে উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে তো দুজনের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য হয়ে গেল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ :أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا جَمِيعًا، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ، فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا فَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ، قَالَ طَلْحَةُ :فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ :بَيْنَا أَنَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِهِمَا، فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوُفِّيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَذِنَ لِلَّذِي اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ، فَقَالَ :ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثُوهُ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ :فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلاَفِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلاَةَ السَّنَةِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক গোত্রের দুজন সাহাবী একসঙ্গে মুসলমান হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিহাদে শহীদ হয়ে গেলেন আর দ্বিতীয়জন এক বছর পর মারা গেলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যিনি এক বছর পর মারা গিয়েছিলেন তিনি সেই শহীদের আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। এতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করলাম যে শহীদের মর্তবা তো অনেক উঁচু; তারই তো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা! এ বিষয়টি আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলাম কিংবা অন্য কেউ আরজ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছে তোমরা কি তার নেকীসমূহ দেখতে পাও না যে, তা কত বৃদ্ধি পেয়েছে? এক বছর তার পূর্ণ একটি রমাজান মাসের রোযাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছয় হাজার রাক'আতের অধিক নামাযও তার আমলনামায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ ২/৩৩৩ হা. ৮৪২০, ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/৩১৩ হা. ৩৯২৫, সহীহে ইবনে হিব্বান ৭/২৪৮ হা. ২৯৮২, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ৩/৩৭১ হা. ৬৫৩০)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. ইবনে মাজাহ শরীফে এই ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত তালহা (রা.), যিনি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নিজে বর্ণনা করেন, একটি গোত্রের দুজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে একসাথে হাজির হলেন এবং একসাথেই তাঁরা মুসলমান হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অত্যন্ত উদ্যমী ও সাহসী। তিনি এক জিহাদে শহীদ হয়ে গেলেন। আর অপরজন এক বছর পর ইন্তেকাল করলেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো আছি এবং ওই

رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، أَوْ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ السَّنَةِ

(মুসনাদে আহমদ ১/১৭৮ হা. ১৫৩৮, সহীহে ইবনে খুযাইমা ১/১৬ হা. ৩১০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২০১ হা. ৭১৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৮ :

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضى الله عنه -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم " :-يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ ,فَيَقُولُ :يَا بَنِى آدَمَ، قُومُوا فَأَطْفِئُوا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ ,وَتَسْقُطُ خَطَايَاهُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، وَيُصَلُّونَ ,فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يُوقِدُونَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى نَادَى :يَا بَنِى آدَمَ، قُومُوا فَأَطْفِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُومُونَ ,فَيَتَطَهَّرُونَ وَيُصَلُّونَ ,فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَيَنَامُونَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم :-فَمُدْلِجٌ فِى خَيْرٍ، وَمُدْلِجٌ فِى شَرٍّ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে হে আদমের সন্তানগণ! ওঠো এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা (নিজেদের গোনাহের কারণে) নিজেদের ওপর জ্বালাতে শুরু করেছো, তা নেভাও। অতএব (দ্বীনদার লোকেরা) ওঠে, ওজু করে এবং যোহরের নামায পড়ে। যদ্দুরুন তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে আসরের সময়, মাগরিবের সময়, এশার সময়। মোটকথা প্রত্যেক নামাযের সময় এরূপ হতে থাকে। এশার নামাযের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর অন্ধকারে কিছুসংখ্যক লোক মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে যায় আর কিছুসংখ্যক লোক সৎকাজে মশগুল হয়ে যায়।

(আল মুজামুল কাবীর [তাবরানী] ১৭৪ হা. ১০২৫, আত্তারগীব ওয়াততারহীব [মুনযেরী] ১/১৪৪ হা. ৯, কানযুল উম্মাল ৭/৩১৪ হা. ১৯০৪৪, হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/১৮৯)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

হযরত সালমান (রা.) একজন বড় মশহুর সাহাবী। তিনি

الْحَدِيثَ، فَقَالَ :مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ؟ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَادًا، ثُمَّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هَذَا الْآخِرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً؟ قَالُوا :بَلَى، قَالَ :وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِى السَّنَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

(ইবনে মাজাহ শরীফ ২/১২৯৩ হা. ৩৯২৫, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ৩/৫২০ হা. ৬৫৩০)

হাদীসটির মান : সহীহ

খ. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দুই ভাই চল্লিশ দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন। তাঁদের মধ্যে যিনি আগে মারা গিয়েছেন তিনি বুজুর্গ ছিলেন। এ জন্য লোকেরা তাঁকে প্রাধান্য দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, দ্বিতীয় ভাই কি মুসলমান ছিলেন না? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন–অবশ্যই, মুসলমান ছিলেন। তবে সাধারণ পর্যায়ের ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের কি জানা আছে যে চল্লিশ দিনের ইবাদত উক্ত ব্যক্তিকে কোন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বস্তুত নামাযের উদাহরণ হলো একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহরের মতো। যা কারো বাড়ির দরজার নিকট দিয়ে প্রবাহিত এবং সে তা থেকে দৈনিক পাঁচবার করে গোসল করে থাকে তবে তার শরীরে কি কোনো ময়লাই থাকতে পারে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার ইরশাদ করেন, তোমরা কি জানো তার ওই সমস্ত নামায, যা সে পরে পড়েছে তা তাকে কোন মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ,حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ,حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ :كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ :فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا، أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ

বলেন, যখন এশার নামায শেষ হয়ে যায়, তখন সমস্ত মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তন্মধ্যে এক দল, যাদের জন্য এই রাত্রি নেয়ামত ও কল্যাণকর হয়, যারা এই রাতকে নেকী অর্জনের অপূর্ব সুযোগ বলে মনে করে। অতএব লোকেরা যখন আরাম-আয়েশ ও ঘুমে বিভোর হয়ে থাকে, তখন তারা নামাযে মশগুল হয়ে যায়। সুতরাং এটি তাদের জন্য সাওয়াব ও নেকীর রাত্র হয়ে যায়। দ্বিতীয় দল, যাদের জন্য রাত চরম মুসিবত ও আজাবস্বরূপ হয়। তারা রাত্রের নির্জনতা ও অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বিভিন্ন গোনাহের কাজে মশগুল হয়ে যায়। সুতরাং তাদের রাত তাদের জন্য মুসিবত ও বরবাদীর কারণ হয়ে যায়। তৃতীয় দল, যারা এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাদের জন্য না মুসিবত, না উপার্জন, না কিছু গেল, না কিছু এল।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ لِيَنْظُرَ مَا اجْتِهَادُهُ، قَالَ :فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ " :حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصِبِ الْمُقَتِّلَةَ -يَعْنِي الْكَبَائِرَ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ :مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنِ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/৪৭ হা. ৪৭৩৬, মুজামুল কাবীর ৪/২১৭ হা.৬০৫১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/৪৮ হা. ১৪৮, আয যুহদ লি আবী দাউদ ১/২৩১ হা. ২৫৬)
হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-৯

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ :حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ :حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ قَالَ :أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ :إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে এই নামাযসমূহ আদায় করবে না তার ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।
(আবু দাউদ শরীফ ১/২৯৯ হা. ৪২০, ইবনে মাজাহ শরীফ ২/১৭ হা. ১৪০৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

আরেক হাদীসে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি অবহেলাবশত এই নামাযে কোনো প্রকার ত্রুটি না করে উত্তমরূপে ওজু করে সময়মতো খুশু ও খুজুর সাথে নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনো ওয়াদা নেই। তাকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ :عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

(মুআত্তা মালেক ১/১২৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৯৬, মুসনাদে আহমদ ৫/৩১৭ হা. ২২৭৭০, আবু দাউদ শরীফ ১/২৯৫ হা. ৪২৫, নাসাঈ শরীফ ২/২৩০ হা. ৪৬১)
হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

যে নিয়ামত সহনশীল তা গ্রহণ করা :

একদিন বাদ আসর মজলিস চলতে ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি। ছোট ছোট পানির ফোঁটা মজলিসে উপস্থিত লোকজনের গায়ে ছিটকে পড়ছিল। তখন তাঁরা মজলিস থেকে উঠে অন্যত্র বসার চেষ্টা করছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত হারদূয়ী (রহ.) বললেন, এমতাবস্থায় যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, পানি আল্লাহর রহমত। আপনারা আল্লাহর রহমত ছেড়ে কোথায় পালাচ্ছেন? তখন কী জবাব দেবেন? শ্রোতাগণ যাঁর যাঁর মতো করে বিভিন্ন জবাব দিলেন। তখন হযরত হারদূয়ী (রহ.) বললেন, প্রত্যেকটিই আল্লাহর নিয়ামত। বৃষ্টি যেমন নিয়ামত, ছায়াদার স্থানও নিয়ামত। রৌদ্র নিয়ামত, ছায়াও নিয়ামত। শীত নিয়ামত, গরমও নিয়ামত। সুতরাং প্রত্যেক নিয়ামতকে নিয়ামত মনে করে নিজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নিয়ামত গ্রহণ করা এবং বাকি নিয়ামতগুলোকে নিয়ামত হিসেবেই বিশ্বাস করা। এক বস্তুকে নিয়ামত হিসেবে বিশ্বাস করে অন্য নিয়ামতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা আদবের খেলাফ নয় এবং নিয়ামত ও রহমত প্রত্যাখ্যান করা নয়। যেমন প্রয়োজনে রোদ থেকে ছায়ায় দিকে যাওয়া কিংবা ছায়া থেকে রোদে চলে যাওয়া। এরূপ করা নিয়ামত থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়। বরং অন্য নিয়ামত ও রহমত তলব করার নামান্তর।

যদি কেউ রহমত ও নিয়্যাত তথা বর্ষা, রোদ, ভীষণ শীত বা ভীষণ গরমকে খাটো বা তুচ্ছজ্ঞান করে তার বিপরীতকে গ্রহণ করে, সেটা আদবের পরিপন্থী। এরূপ করা নিষেধ। বরং খেয়াল রাখতে হবে সবই আল্লাহর নিয়ামত এবং রহমত। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে আমরা সেগুলো সহ্য করতে পারছি না। তাই যে নিয়ামত ও রহমত আমাদের সহনশীল-সংবেদনশীল সেদিকেই আমরা ফিরে যাচ্ছি। আমাদের অন্তরের বিশ্বাস এরূপই হওয়া উচিত। অসহনশীল নিয়ামত থেকে সহনশীল নিয়ামতের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য দু'আও করা উচিত। যেমন রোগও আল্লাহর নিয়ামত, সুস্থতাও আল্লাহর নিয়ামত। রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা, রোগ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং সুস্থতার জন্য দু'আ করা যায়। সে ক্ষেত্রে দু'আটা এরূপ করা যায়–হে আল্লাহ! রোগও আপনার নিয়ামত, কিন্তু আমি দুর্বল, তা সহ্য করার মতো শক্তি আমার নেই। তাই আপনার ফজল ও করমে সুস্থতার নিয়ামত দান করুন। রোগের নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা বদলে দিন। এর জন্য তদবীর ও চিকিৎসা করা সুন্নাত। বরং কোনো কোনো সময় তা আবশ্যকও হয়ে পড়ে।

মোটকথা হলো, এক নিয়ামত থেকে অন্য নিয়ামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ওই নিয়ামতকে নিয়ামত মনে করে বরং নিজেকে সে নিয়ামত উপভোগ করার ক্ষেত্রে দুর্বল মনে করেই অন্য নিয়ামতের দিকে যাওয়া। ওই নিয়ামতকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

শায়খের মজলিসে যদি গীবত হয় তখন কী করবেন?

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যদি কোনো শায়খ বা পীরের মজলিসে কারো গীবত করা হয় এবং মনে করা হয় সেটা পাপপূর্ণ সমালোচনার আওতায় পড়ে যাচ্ছে তবে উক্ত মজলিস থেকে উঠে যাওয়া জরুরি। যেমন–কোনো স্থানে বৃষ্টির ছিটা গায়ে পড়তে থাকলে সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া হয়। বৃষ্টি আল্লাহর রহমত কিন্তু ওই অবস্থায় সেটা সহনশীল নয় বিধায় সেখান থেকে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থান খুঁজতে হয়। তেমনি শায়খ বা পীর সাহেবের মজলিসে আল্লাহর রহমত নাযিল, বরকতের মজলিস হয়ে থাকে কিন্তু যখন গীবতের ফোঁটা পড়তে থাকবে তখন সেখান থেকে প্রস্থান করে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে।

এই কথায় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, এমতাবস্থায় তো শায়খ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে, যা চিন্তাকে কলুষিত করবে।

উত্তরে বললেন, খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই খারাপ ধারণাটা হতে হবে আকলী। তবঈ নয়। তা দূর করার জন্য চিন্তা করতে হবে এই গীবত বা সমালোচনাটা আমার জন্য পাপপূর্ণ গীবতের শামিল। তাই আমার জন্য পৃথক হয়ে যাওয়াই আবশ্যক। হতে পারে শায়খের জন্য সেটা গীবতে জরুরি বা মানবীয় দুর্বলতার কারণে হয়েছে। সামান্য সতর্ক করলে ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাওবা নসীব হয়ে যাবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

ক্ষমা করা মহৎ গুণ

সমাজে চলতে গিয়ে একজন মানুষের ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। অভিজ্ঞ দুজন চালকও অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে। অনুরূপ অভিজ্ঞ মানুষের পরস্পরে মতানৈক্যও হতে পারে। তবে মানুষ হিসেবে করণীয় হলো, একে অপরকে ক্ষমা করে দেওয়া।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তারা যেন ক্ষমা করে মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করুক। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু। (নূর ২২)

হাদীস শরীফে আছে, দুনিয়াতে যে অন্যের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবেন।

অন্য হাদীসে আছে -

ومازاد الله عبدا بعفو الا عزا

ক্ষমা করলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ইজ্জত সম্মান আরো বৃদ্ধি করে দন। (মুসলিম)

অতএব মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় হলো, অন্যের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া, মন থেকে বের করে দেওয়া। মন থেকে দুঃখ-কষ্ট বের করে দিলে মনের ভেতর ঘৃণা থাকবে না, শত্রুতা থাকবে না। অন্তরের বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। অন্তরে দুঃখ-কষ্ট লালন করলে তা একসময় শত্রুতায় রূপ নেয়। ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা–সবই ইসলামে নিন্দনীয়।

বিদ্বেষমুক্ত অন্তর বলতে বোঝানো হয় যাতে অন্যের প্রতি ঘৃণা থাকে না। কারো প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধ থাকে না। কোনো মুমিনের প্রতি অন্তরে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা উচিত নয়। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো, পরস্পরে সদয় হওয়া, اشداء على الكفار رحماء بينهم অতএব সত্যিকারের মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট বিদ্বেষমুক্ত অন্তর কামনা করুন। কেউ কষ্ট দিলে ক্ষমা করে দিন–এটাই নববী আখলাক।

ক্রোধ দমন :

কেউ কখনো কষ্ট দিলে ভাববেন, তার ভুল হয়ে গেছে। তার থেকে ত্রুটি হয়ে গেছে, এ কথা ভেবে তাকে মাফ করে দিন। বিনিময়ে আপনিও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবেন। কোনো বিষয়ে রাগ উঠলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, দমন করুন। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা, দমন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু এর প্রাপ্তিও বিশাল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করল, প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত রইল, অথচ সে তার রাগ প্রয়োগ করার পূর্ণ সামর্থ্যবান ছিল। ইচ্ছা করলেই প্রতিশোধ নিতে পারত, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে সে তার রাগ দমন করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাঁর দিদার দান করবেন। সে আল্লাহর নূর অবলোকন করবে। অতএব নিজেই ভেবে সিদ্ধান্ত নিন, কোন সওদাটা ভালো, দুনিয়ায় রাগ প্রকাশ করে প্রতিশোধ নেওয়া, নাকি ক্ষমা করে দিয়ে আখেরাতে আল্লাহর দিদার ও দর্শন লাভ করা।

আকলের যাকাত :

একজন মুমিন যখন এ বিষয়গুলো সামনে রাখে তখন তার মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টি হয়। সহনশীলতা হলো, কেউ বোকামি করে কিছু করলেও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। মুহাল্লাব বিন আবু সুফরাকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

ماتقول فى العفو والعقوبة؟ قال هما بمنزلة الجود والبخل، فاختر ايهما شئت

ক্ষমা ও প্রতিশোধের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, এ দুটি জিনিস উদারতা ও কৃপণতার পর্যায়ের। অতএব নিজেই ঠিক করো তুমি কোনটি অবলম্বন করবে। অর্থাৎ কৃপণ হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আর উদার হলে ক্ষমা করো। আরো প্রসিদ্ধ আছে, العفو زكاة العقل বোকা ও অপরিণামদর্শীর কাজ ও কথায় সহনশীলতা প্রদর্শন করা মানুষের আকল ও জ্ঞানবুদ্ধির যাকাত, তাই শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের উচিত ছোট ছোট বিষয়ে মনের ভেতর রাগ লালন না করে অন্যের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া। অতএব যদি নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে বিশ্বাস করেন, নিজের মধ্যে আসল জ্ঞানবুদ্ধি থাকার বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তাহলে এর যাকাত আদায় করুন। আর জ্ঞানবুদ্ধির যাকাত হলো ক্ষমা করা। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে সবাই চায়, মানুষ আমার বড় বড় ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুক। কিন্তু সে নিজে অন্যের সামান্য ভুলত্রুটি ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়।

মানুষের প্রকার :

ছোট ছোট দুটি প্রাণী আছে। আকার-আকৃতিতে প্রায় একই–একটি

মাছি, অন্যটি মৌমাছি। আকার-আকৃতিতে প্রায় সমান হলেও দুটি প্রাণীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মাছির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা–সব কিছুই দুর্গন্ধ, নাপাককেন্দ্রিক। তাই সে নাপাক খুঁজে বেড়ায়, দুর্গন্ধের সন্ধানে থাকে। দুর্গন্ধ ও ময়লা-আবর্জনার স্থানে ঘুরঘুর করতে থাকে। নিজের শরীরে জীবাণু বয়ে বেড়ায়, দুর্গন্ধ ও নাপাকির নেশায় সে বিভোর থাকে। তার চিন্তা দুর্গন্ধময়, তাই তার পছন্দ পুঁতিদুর্গন্ধময় আবর্জনা। পক্ষান্তরে মৌমাছির চিন্তা-ভাবনা সুগন্ধিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাই সে ফুলের সন্ধানে বাগান খুঁজে বেড়ায়, ফুলে বসে মধু আহরণ করে, মধু নিয়ে উড়ে বেড়ায়। তার চিন্তা-ভাবনা থাকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ। সে সব সময়ই সুগন্ধিময় বস্তু খুঁজে বেড়ায়। এই দৃষ্টান্তটি মাথায় রাখলে দেখা যায়, মানুষও দুই ধরনের। কিছু মানুষ আছে মৌমাছির মতো। তাদের মধ্যে কল্যাণময় চিন্তা থাকে, অন্যের ভেতরও তারা কল্যাণ খুঁজে বেড়ায়। অন্যদের কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, অন্যের ভালো দিকগুলোই দেখে, তাদের দৃষ্টিতে সব মানুষ ভালো, কারণ সে নিজে ভালো। আর কিছু মানুষ আছে মাছির মতো, যাদের চিন্তা-ভাবনা পুঁতিদুর্গন্ধময়, যাদের ভেতরটা দুষ্টামি, নষ্টামি এবং ভ্রষ্টতা দিয়ে ভর্তি থাকে। দুষ্ট লোকের আসরই তাদের ঠিকানা। মন্দ লোকের সঙ্গেই তাদের বন্ধুত্ব ও খায়খাতির। অন্যের মধ্যেও মন্দগুণ দেখতে পায়। কারো ভালো গুণ তাদের চোখে পড়ে না। শুধু খারাপটাই দেখে। তাদের বলতে শোনা যায়, এখনকার মানুষ ভালো নয়। মানুষ আর মানুষ নেই। মূলত এরা হলো মাছির মতো, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। সেগুলো গেয়ে বেড়ায়। মন্দ কথা বলবে। মন্দ কথা শুনবে, দুষ্ট ও নষ্টদের বন্ধুত্ব সংস্পর্শের প্রতিই তাদের পূর্ণ মনোযোগ ও আকর্ষণ। কারণ তাদের অন্তর ও মস্তিষ্কজুড়ে সব সময় দুষ্টামি ও নষ্টামি বিরাজমান থাকে।

দুষ্ট ও ইতর শ্রেণীর লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই। কারণ কয়লা ঠাণ্ডা হলেও হাতে ময়লা লাগবে, গরম হলে তো হাতই জ্বলে যাবে। বোঝা গেল, কয়লা ঠাণ্ডাও ভালো না, গরমও ভালো না। তেমনি দুষ্ট ও ইতর শ্রেণীর লোকের বন্ধুত্বও ভালো না, আবার শত্রুতাও সুখকর নয়। তাই তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মৌমাছির মতো সুগন্ধি ও ফুল অনুসন্ধানকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহে কালিমায়ে তায়্যিবাহ

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

পবিত্র কোরআনে 'কালিমায়ে তায়্যিবাহ'

কালিমায়ে তায়্যিবাহর প্রথম অংশটি 'সূরা সাফফাত'-এর ৩৫ নং আয়াত এবং দ্বিতীয় অংশটি 'সূরা ফাত্হ'-এর ২৯ নং আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ(سورة الصافات ٣٥)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ(سورة الفتح ٢٩)

হাদীস শরীফে 'কালিমায়ে তায়্যিবাহ' :

عن عبد اللّٰه بن بريدةرضى الله عنه عن أبيه قال :انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبى ذروأنا معهم يطلب رسول الله- صلّى الله عليه وآله وسلّم -وهو مستتر بالجبل فقال له أبو ذر :يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال :أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.(الإصابة ٣٦٥/٦)

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যর ও তাঁর চাচাতো ভাই নুআঈম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খোঁজে বের হলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন পাহাড়ের আড়ালে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পেয়ে) আবূ যর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট এসেছি আপনি কী বলেন তা শুনতে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি বলি

لا إله إلا الله محمد رسول الله

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ]।' অতঃপর আবূ যর ও তাঁর সঙ্গী তাঁর ওপর ঈমান আনলেন।

[আল ইসাবা, ইবনে হাজার : ৬/৩৬৫। হাদীসটির সনদ সহীহ]

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه :لا إله إلا الله محمد رسول الله . لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به :حيان بن عبيد الله .(رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط ٢١٩)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঝাণ্ডা ছিল কালো এবং পতাকা ছিল সাদা রঙের। এই পতাকায় লেখা ছিল لا إله إلا الله محمد رسول الله [লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ]।

[আল মুজামুল আওসাত তাবারানী, হাদীস : ২১৯। হাদীসটির সনদ সহীহ]

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فص خاتم النبى صلى الله عليه وسلم حبشيا، وكان مكتوبا عليه :لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله سطر، ومحمد سطر، ورسول الله سطر .(رواه أبو الشيخ فى أخلاق النبى ٣٣٥)

অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আংটির পাথরটি ছিল আবিসিনিয়া এলাকার। আর তার ওপর লেখা ছিল–

لا إله إلا الله محمد رسول الله

[লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ]। (ওপরের) প্রথম লাইন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু', দ্বিতীয় লাইন 'মুহাম্মাদ' তৃতীয় লাইন 'রাসূলুল্লাহ'।

[আখলাকুননবী, আবুশ শাইখ আল আসবাহানী, হাদীস : ৩৩৫। হাদীসটির সনদ সহীহ]

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم حدثه، قال :من خالف دين الله من المسلمين فاقتلوه،

'মেরাজের রাত্রে আমি বেহেশতে প্রবেশের প্রাক্কালে তার দুইপাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা তিনটি লাইন দেখতে পাই–

এক. لا إله إلا الله محمد رسول الله আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

দুই. وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا [আমরা যা (ভালো কর্ম) পেশ করেছি তা পেয়েছি, আর যা খেয়েছি তা থেকে উপকৃত হয়েছি, যা ছেড়ে এসেছি সে ব্যাপারে তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি]।

তিন. أمة مذنبة ورب غفور উম্মত হলো গোনাহগার আর রব হলেন ক্ষমাশীল।

[তবা কাতুশ শাফিইয়্যাহ : ১/১৫০। ইমাম সুয়ূতী তাঁর জামেউস সগীরে (৬৮০৮) নং হাদীসে আল্লামা রাফেয়ী ও ইবনে নাজ্জারের হাওয়ালায় উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি সহীহ]।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لما عرج بى إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فى عارضى الجنة ثلاثة أسطر مكتوبات بالذهب :الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والثانى وجدنا ما قدمنا وربحنا ما أكلنا وخسرنا ما تركنا، والثالث أمة مذنبة ورب غفور . (رواه الرافعى وابن النجار كما قال السيوطى فى الجامع الصغير ٦٨٠٨ ورمز له بالصحة .وذكره السبكى فى طبقات الشافعية ١/١٥٠ بإسناد الديلمى)

অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল আসবাহানী, হাদীস : ২৩২। হাদীসটির সনদ সহীহ)

ومن قال :لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا من أصاب حدا، فإنه يقام عليه .(رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى طبقات المحدثين ٢٣٢)

অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করবে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করবে) তাকে তোমরা হত্যা করে ফেলো। আর যে

لا إله إلا الله محمد رسول الله

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলবে তাকে কিছু বলার অধিকার কারো নেই। তবে কোনো দণ্ডের উপযুক্ত হলে তা তার ওপর কার্যকর করা হবে।'

(ত্ববাকাতুল মুহাদ্দিসীন, আবু শাইখ

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

নমুনায়ে আসলাফ হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)

মূল : মুফতী আবুল কাসেম নুমানী
মুহতামিম : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এর স্মৃতিবিজড়িত বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাদানিয়ায় বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মহাপরিচালক শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী কর্তৃক প্রদত্ত বয়ান। ১৭/০২/২০১৭ জুমাবার।

الحمدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله ، لقدجاء رسول ربنا بالحق صلوات الله عليهم أجمعين
أما بعد **!**فقد قال النبى -صلى الله عليه وسلم -إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، أوكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

হে উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে মিল্লাত, আসাতেযায়ে ইযাম, আযীয তলবা ও হাজেরীনে মজলিস!

পবিত্র এই মসজিদে আমার আসা এবারই প্রথম নয়। হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর শুভ জীবদ্দশায় হযরতের প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে বারবার আসা-যাওয়া হয়েছে এবং কিছু বলারও সুযোগ হয়েছে। সে সময় আর এ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্য হৃদয়ে বারবার নাড়া দিচ্ছে তা হলো, হযরত (রহ.)-এর অনুপস্থিতি। আগে যখন উপস্থিত হতাম গত বছরের আগের বছর, হযরত (রহ.) তখন কামেল শফকত ও মোহাব্বত, দুর্বার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। হযরত (রহ.)-এর উপস্থিতিতে মজলিসজুড়ে এক বরকতময় পরিবেশ বিরাজ করত; কিন্তু আজ তাঁর বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এটাই অমোঘ বিধান। এখানে কেউ চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য আসে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে যে দরদভরা, আবেগপূর্ণ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বে-নজির গভীর সম্পর্ক ছিল; অনুকরণ-অনুসরণের অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক যে মাযবুত তা'আল্লুক ছিল তা দুনিয়ার কারো সাথে কারো- না হতে পারে, না হয়েছিল, না হবে; তার কোনো দৃষ্টান্ত না আগে কখনো ছিল, না আছে, আগামীতেও কখনো পাওয়া যাবে না। কিন্তু এত কিছুর পরও সাহাবায়ে কেরামকে জানের চেয়ে প্রিয় রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায়ের তিক্ততা মেনে নিতে হয়েছে। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে, যে মহৎ উদ্দেশ্যার্জনের জন্য শুভাগমন করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম কী করেছেন? নবীপ্রেমিক সাহাবায়ে কেরামের মনেপ্রাণে বিষণ্নতা ছেয়ে গিয়েছিল। তাঁদের হৃদয় বিদায়ের আঘাতে কঠিন ব্যথায় ভরে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও মাতম-ফরিয়াদ, মর্সিয়া ও আহাজারির পথ অবলম্বন করেননি। বরং যে মহা উদ্দেশ্যসাধনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন তার পূর্ণাঙ্গতা বিধানে, যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন সে মহান দ্বীনের হেফাজত ও পৃথিবীজুড়ে তার প্রচার-প্রসারের কাজে সাহাবায়ে কেরাম আপন জান-মাল ও যোগ্যতা–সব কিছুই ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাই তো দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর পর যখন আরবের একটি জামাত যাকাতদানে অস্বীকৃতি জানাল তখন সিদ্দীকে আকবর (রা.) হুঙ্কার ছাড়লেন, ঘোষণা দিলেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আর তখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নিজস্ব মতামত পেশ করতে গিয়ে বলেন, হে খলিফাতুর রাসূল! এসব লোক কালিমাপড়ুয়া মুসলমান, তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর স্বীকৃতি প্রদানকারী, তারা নামায কায়েম করে; শুধু যাকাতকে অস্বীকার করার কারণে কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে? তাঁর প্রতিউত্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, যা এক ঐতিহাসিক বাক্য, যে বাক্য প্রবল ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে হৃদয়ে গভীর থেকে বের হয়েছিল।

أينقص الدين وأنا حى

উমর! আমি বেঁচে থাকব, আর আল্লাহর রাসূলের আনীত দ্বীনের অঙ্গহানি হবে? তা কখনো হতে পারে না। আমার জীবন কি কাজে আসবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে গেলেন, আমি বেঁচে থাকব আর আমার

উপস্থিতিতে দ্বীনের অঙ্গহানি হবে? স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা বিধান করে গিয়েছেন যার তাকমীলের ব্যাপারে আয়াতও নাযিল হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة ٣)

তরজমা : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।" (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

আল্লাহর রাসূল এক কামেল-মুকাম্মল দ্বীন আমাদের হাতে আমানত রেখে গিয়েছেন। সুতরাং তার হেফাজত করা, স্বমহিমায় বহাল রাখাই হলো আমাদের প্রধান কর্তব্য। তার কোনো একটি অংশের সংকোচন কিংবা কর্তন হলে নববী ওয়ারাছতের মাকসদ বাকি থাকবে না। আমি দৃঢ়সংকল্প করেছি যে কেউ যদি আমাকে সমর্থন নাও করে তবে আমি একাই তাদের সাথে যুদ্ধ করে যাব। হযরত উমর (রা.) বললেন, হযরত আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল তাই আলোচনা করলাম আমিও আপনার সাথে রয়েছি।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এ কথা চিরসত্য যে সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাই আকাবের ও বুজুর্গদের সত্যিকারের উত্তরসূরি, যাঁরা বড়দের আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন, যাঁরা তাঁদের মিশনকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়েছেন এবং জীবনযুদ্ধে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছেন। যাঁরাই এ কাজ করেছেন তাঁরা চির সফল হয়েছেন। বুজুর্গ ব্যক্তিদের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ, তাঁদের প্রতিষ্ঠান-সংস্থা ও তাঁদের আন্দোলন একমাত্র তখনই যিন্দা থাকবে ও চির বেগবান থাকবে, যখন তাঁদের মাকছাদকে, তাঁদের প্রোগ্রামকে, তাঁরা জীবদ্দশায় যে কাজ করতেন সেসবকে তাঁদের উত্তরসূরিরা নিজের কাজ বানিয়ে নেবে।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে, নববী তেজে তেজীয়ান হয়ে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা এককথায় অনন্য ও বে-নজির। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) প্রচুর আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে, আকাশচুম্বী হিম্মত নিয়ে, প্রবল ইসলামী জোশ-জযবা নিয়ে দ্বীনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। চাই তা মাহফিলে তেজোদ্দীপ্ত বয়ান দিয়ে হোক, চাই তা আওয়ামদের দ্বারে উলামায়ে রাববানিয়ীনের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য বড় বড় ইজতিমার আয়োজন হোক, চাই তা উলূমে নবুয়াতের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফিকহী যোগ্যতা ও তাফাক্কুহ-তাদাব্বুর সৃষ্টির জন্য ও ফাকাহতের মধ্যে মেহারতের জন্য মক্তব-মাদরাসা কায়েমসহ উচ্চতর গবেষণা বিভাগের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হোক। উপরোক্ত ক্ষেত্রেগুলোর সাথে সাথে তিনি ইসলাহে নফসের ময়দানেও মেহনত-মোজাহাদা করেছেন, তিনি একাই সে অসাধ্য সাধন করেছেন, যা সাধারণত অনেকেই সম্মিলিত আকারে করতে অক্ষম।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া! হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া সকল কাজ যিন্দা রয়েছে এবং আপন গতিতে চলছে। আমি উত্তরসূরি শব্দটি ব্যবহার করেছি তা থেকে শুধু হযরতের রক্তের সম্পর্কীয় সাহেবজাদারাই উদ্দেশ্য নন যে হযরতের সাহেবজাদারাই হযরতের ছেড়ে যাওয়া কর্মতৎপরতার জিম্মাদার হবেন বরং উত্তরসূরিদের মধ্যে সে সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা হযরতকে মুরব্বি মেনে তাঁর কাজে শরীক ছিলেন এবং তাঁর সহায়ক ছিলেন, চাই তাঁর ছেলে-সন্তানেরা হোন, চাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের আসাতেযায়ে কেরাম হোন কিংবা তাঁর শাগরিদ হোন, চাই এমন ব্যক্তি হোন, যাঁরা তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন, চাই তাঁর মাদরাসায় তা'লীম অর্জনরত ছাত্র ভাইয়েরা হোক কিংবা সেসব সৌভাগ্যবানরাই হোক, যাঁরা হযরতের সাথে মোহাব্বত ও আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। উপরোক্ত সকলের জিম্মাদারি হলো হযরতের মিশনকে এগিয়ে নেওয়া।

হযরতের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? ঈমানী যে দৌলত, ইসলামী যে জোশ-জযবা তাঁর হৃদয় গহিনে লুকায়িত ছিল, যা তাঁকে প্রতিটি বড় বড় কাজে আগ বাড়িয়ে দিয়েছিল; তাঁকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সাহায্য করেছেন; তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও তাঁর নিকট আহাজারি করে চেয়ে নেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্টাবলির উপর অটল ও অবিচল থাকা সহজসাধ্য ছিলনা বরং অনেক কঠিন মেহনত-মোজাহাদার করতে হয়েছে তাঁকে। চলতে হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ- বিপদসঙ্কুল পথে। আল্লাহ রাববুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ তাওয়াজ্জুহের সাথে এই পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এ ছাড়াও যে বৈশিষ্ট্যটি দীপ্তিময় হয়ে ওঠে তা হলো, দৃঢ়সংকল্প ও আকাশছোঁয়া হিম্মত ও আযীমত।

আযীমতের উপর চলা কোনো সহজসাধ্য কাজ নয়। আজীমত বলা হয়, যখন কোনো কাজের ইরাদা করবে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে সে কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া। সে ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে অবস্থার অনুকুল-প্রতিকুলতার দিকে লক্ষ করা যাবে না। বরং পুরোপুরি আল্লাহর রহমতের উপর আস্থা ও ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে। কাজটি যদি

আল্লাহর জন্য হয়, দ্বীনের জন্য হয় তবে যতই ঝড়-তুফান ও বাধা-বিপত্তি আসুক পরোয়া করা যাবে না। আল্লাহর জন্য কোনো কাজ সম্পাদনে নিন্দুকের নিন্দার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। সহীহ হলে অবশ্যই করতে হবে, কেউ সমর্থন করুক আর না করুক, কেউ ভালো-মন্দ বলুক আর না বলুক। মনে রাখতে হবে, এত কিছু করার পরও সবার দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সবার নিচে মনে করতে হবে এবং নিজের মধ্যে সব সময় বিনয়-বিনম্রতা ভাব বজায় রাখতে হবে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য-গুণাবলি সবই মুফতী সাহেব (রহ.)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল, যা ছোটরাও ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। হযরত অনেক বড় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ছোটদের সাথে তাঁর এ ধরনের সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের ধারাবাহিকতার কারণে মনে হতো এসব স্বয়ং তার খাতিরেই করা হচ্ছে।

নিসবত তথা সম্পর্কের প্রতি সদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বংশীয় নিসবত হোক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক নিসবত। প্রত্যেকটির যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, হযরতের উস্তাদ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর আওলাদের কেউ তাশরীফ আনলে তাঁর সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা দেখে মনে হতো তাঁর উস্তাদজাদাও যেন তাঁর উস্তাদ। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর সাহেবজাদাদের মধ্যেও সেসব গুণাবলি বিরাজমান।

তেমনি দারুল উলূম দেওবন্দের যে কোনো ব্যক্তি খাদেম আগমন করলে সকলকে তিনি অকল্পনীয় সম্মান করতেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম, দারুল উলূমের সাথে সম্পর্কিত কেউ তাঁর মেহমান হলে তিনি এমন বৃদ্ধ ও অসুস্থাবস্থায়ও উক্ত মেহমানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। একসময় আমি এসে চিন্তা করছিলাম হযরতের সাথে দেখা করব, আলোচনা করব। ইত্যবসরে হযরত নিজেই উপস্থিত হয়ে গেলেন। মেহমানের দেখাশোনা, খবরগীরীতে সব সময় ব্যস্ত সময় পার করতেন তিনি। মেহমানের আগমন থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সময়ে তাঁর ছোট-বড় যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা পুরণ করা নিজের জিম্মাদারি মনে করতেন। তাঁর জরুরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, খাদেমদের সতর্ক করতেন, পুরোপুরি নিজের নেগরানীতেই সব কিছু করতেন। এতদসত্ত্বেও চিন্তা করতেন মেহমানের সব কিছু পূরণ হলো কি না! আমাদের মধ্যে এরূপ জযবা হওয়া চাই।

আযীমত (প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি) ও তার সাথে গায়রতে ঈমানী (ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ) থাকা উচিত, যা উলামায়ে দেওবন্দের এক স্বতন্ত্র মসলক ও মত-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। দেওবন্দিয়্যাতের পরিচয়ে যে দুটি বিষয় আপন মহিমায় দীপ্তিময় হয়ে ওঠে তা হলো, হামিয়্যতে দ্বীনি (দ্বীনি আত্মসম্ভ্রমবোধ) ও গায়রতে ঈমানী (ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ)।

দ্বীনের হামিয়্যতের অর্থ হলো, দ্বীনবিরোধী কোনো কিছুই বরদাশত না করা, এটাই দ্বীনের চাহিদা, এটাই ইসলামের দাবি।

আত্মমর্যাদাবোধ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে তথা বংশীয় আত্মমর্যাদাবোধ, দেশীয় আত্মমর্যাদাবোধ, গোত্রীয় আত্মসম্মানবোধ, ও পার্টিগত আত্মসম্মানবোধ। ঈমানী ও দ্বীনি হামিয়্যত তথা আত্মমর্যাদাবোধ থেকে কী উদ্দেশ্য? ঈমানের যে দাবি ও দ্বীনের যে চাহিদা তার বিরুদ্ধে কিছুই বরদাশত না করা। তদ্রূপ হামিয়্যতে দ্বীনিতে দ্বীনের বিরুদ্ধে যা গ্রহণযোগ্য নয় চাই তা জীবন ও সমাজের রীতি-নীতিতে হোক, চাই তা শরীয়তের আহকামে হোক إن الدين عندالله الإسلام এর মধ্যে যে দ্বীনের কথা বলা হয়েছে সে দ্বীনবিরোধী কোনো কথা, কোনো কাজই বরদাশত করা হবে না। আর গায়রতে ঈমানী থেকে উদ্দেশ্য হলো, যদি ঈমানের ওপর আঘাতকারী চাই সে যেই হোক; কোনো ব্যক্তি হোক কিংবা জামাত হোক, চাই তা কোনো সংস্থা হোক কিংবা কোনো মসলক ও মত-বিশ্বাস হোক সামনে চলে আসলে এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে প্রথমে আমার গর্দানকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে প্রতিরোধী শক্তিসঞ্চয়ে নাযরানা পেশ করব। চাই বেরেলবী ফিতনা হোক বিংবা মাওদূদিয়্যতের ফিতনা হোক, চাই তা শিয়া-বিদ'আতের ফিতনা হোক কিংবা অন্য কোনো নয়া ফেরকার ফিতনা হোক, তা কোনোভাবে বরদাশত করা হয়নি।

উপমহাদেশে যত বাতেল মতবাদের উত্থান হয়েছিল, যত ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যাঁরা আওয়াজ তুলেছেন এবং যাঁরাই মাঠে-ময়দানে তাদের মোকাবিলা করেছেন তাঁরা হলেন আকাবেরে দেওবন্দ; সে যুগেও, এ যুগেও। চাই তাঁরা দেওবন্দের বাসিন্দা হন কিংবা পাকিস্তানের হন, চাই তাঁরা বাংলাদেশি হন কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্রের হন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) এর পুরো জীবন জুড়ে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ছোট বড় দেশী বিদেশী যে কোনো ধরণের ফিতনা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভূত হওয়া মাত্রই হিকমত ও প্রজ্ঞার সহিত এর মোকাবেলায় ময়দানে নেমে পড়তেন। যখন উলামায়ে দেওবন্দ বলা হয় তখন তা থেকে উদ্দেশ্য শুধু সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ গ্রামের অধিবাসীরাই নন। বরং যাঁরাই দেওবন্দের চিন্তা-চেতনা নিজের মধ্যে ধারণ করে, যাঁরাই তাঁর চিরন্তন ঝর্ণাধারা থেকে পিপাসা নিবারণ

করেছেন তাঁরাই উলামায়ে দেওবন্দ থেকে উদ্দেশ্য চাই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই অবস্থান করুন। ঈমানবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকেই বলে ঈমানী গায়রত, যা ছিল আমাদের আকাবেরীনে দেওবন্দের চালিকাশক্তি। যার কারণেই সিদ্দীকি হুঙ্কারে একবার পুরো বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল। এই ঈমানী গায়রতের কারণে সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেছিলেন,

أينقص الدين وأنا حى

আমি বেঁচে থাকব আর রাসূল (সা.)-এর আনীত দ্বীনের অঙ্গহানি হবে?

হে প্রিয় ভাইয়েরা! হে প্রিয় তালেবে ইলমগণ! যাঁরা আজ মাদরসায় পঠন-পাঠনে রয়েছেন, যেসব নওজোয়ান আসাতেযা জিম্মাদারি নিয়ে কাজ করছেন আপনারা নিজেকে তুচ্ছ মনে করবেন না, হীনমন্যতার শিকার হবেন না। নিজেকে অসহায়, দুর্বল, শক্তিহীন ও বে-সাহারা মনে করবেন না। ভবিষ্যতেও আপনাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা কাজ নেবেন। কিন্তু হিম্মত ও মনোবলে হতে হবে অবিচল, লক্ষ্যে হতে হবে অব্যর্থ ও চিন্তা-চেতনায়, ইচ্ছাশক্তিতে হতে হবে পাহাড়সম অটল।

শুরুতে আমি হাদীস শরীফ পাঠ করেছিলাম। রাসূল (সা.) বলেছেন,

إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله

যখন আল্লাহ তা'আলা নিজ কোনো বান্দার ব্যাপারে খায়রের ফয়সালা করেন তবে তার থেকে কাজ নেন ও তাকে দ্বীনি কাজে নিয়োজিত করেন।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনোই আমাদের মোহতাজ নন। আল্লাহ তা'আলা যে কারো থেকে কাজ নিতে পারেন। ইতিহাস সাক্ষী নমরুদকে মাছি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন, মালাউন আবরাহাকে আবাবিল দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর সামান্য বাতাস বয়ে যাওয়াতে কাওমে আদ-ছামূদ ধ্বংস হয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ হবে যদি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের খিদমতের জন্য কবুল করেন। এই ঈমানী জোশ-জযবা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা থেকে চাইবেন। আর নিজের বড়দের, আসাতেযায়ে কেরামের সাথে ও আকাবেরদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন, যাতে বাতেনও বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং কাজও চলমান থাকে। তবে এসব কিছু বড়দের বড়ত্ব স্বীকার্যপূর্বক হতে হবে। তাদের থেকে মাশওয়ারা ও দিকনির্দেশনা নিতে থাকবেন। তাঁদের খিদমতে এমনভাবে নিয়োজিত হবেন, যাতে তাঁদের মধ্যে এ কথার বিশ্বাস জমে যে তাঁরা যেকোনো কাজ আপনার নিকট থেকে নিতে পারবেন। এভাবে যদি ইনফেরাদী ও খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলি মাযবুত হয়ে যায় তবে তা ইজতেমাঈ ও সম্মিলিত শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আর বড়রা অনুভব করবেন, আমরা আর একা নই। সত্যের পক্ষে যে আওয়াজ উঠাব এবং যে প্রোগ্রাম হাতে নেব তারা সকলেই আমাদের সাথে থাকবে, যারা হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) কর্তৃক লাগানো এই বীজ থেকে উপকৃত হচ্ছে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিল, তারা সবাই আমাদের আহবানে লাব্বাইক বলবে। তারা আমাদের শক্তিতে পরিণত হবে। কারো থেকে আল্লাহ তা'আলা কাজ নিতে চাইলে নিয়ে নেবেন চাই যে স্তরেরই হোক। বয়সও সেখানে ধর্তব্য নয়। ৯ বছরের হোক কিংবা নব্বই বছরের হোক। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো খিদমত নেওয়ার ইরাদা করবেন না তখন কারো পক্ষে কাজ করা সম্ভবও হবে না। যেমন হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) আমাদের ইমামুল আকবার। তিনি চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরে ইন্তিকাল করেছেন। হযরত গুঙ্গুহী (রহ.) দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত কাসেম নানূতবী (রহ.) হায়াত পান খুবই অল্প। কিন্তু আজ দুনিয়া জুড়ে উভয়ের নাম সমানভাবে নেওয়া হয়। হযরত থানভী (রহ.) বয়স পেয়েছেন। আরো অনেক মহামনীষী এমন রয়েছেন, যাঁরা খুব কম বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। যেমন মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী (রহ.) হয়তো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পেয়েছেন। আর যখন তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন মনে হয় মারেফতের এক মহাসমুদ্র। কম বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে অনেক কাজ নিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হায়াত মোবারক ছিল মাত্র ৬৩ বছর। অনুরূপ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বয়সও ছিল ৬৩ বছর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদের থেকে এমন কাজ নিয়েছেন যে পৃথিবীজুড়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলছে, যা থেকে সকলে মুক্তমনে নিঃশ্বাস নিতে পারছে এবং তাঁদের মোহাব্বত ও তাঁদের আজমত আজ ঈমানের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাকেই মূল্যায়ন করুন এবং দৃঢ়সংকল্পের ওপর অবিচল থাকুন। সিনায় আকাশছোঁয়া হিম্মত রাখুন আর বড়দের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখুন। মনে রাখবেন, বিদায় নেওয়া বুজুর্গদের সাথে সত্যিকারের মোহাব্বত ও সম্পর্কের দাবি হচ্ছে তাঁদের মিশনকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নেওয়া, তাঁদের জীবনকে নিজেদের জীবনের জন্য আদর্শরূপে গ্রহণ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত করবেন ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদ : মুফতী আতীকুল্লাহ

উচ্চারণভেদে তালাক

মুফতী শরীফুল আজম

তালাক কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে এর উচ্চারণ বা শাব্দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। যে ধরনের শব্দ বলা বা লেখা হবে সে অনুযায়ী তালাক বাস্তবায়ন হবে। নিয়ম অনুসারে না হলে অনেক ক্ষেত্রে তালাক কার্যকর হয় না বরং পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক বহাল থাকে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হয় সেখানেও বায়েন, রজয়ী নাকি মুগাল্লাজ কোন প্রকারের তালাক হয়েছে তা নির্ভর করে উচ্চারণ বা শব্দের প্রয়োগের ওপর। অতএব তালাকের ফয়সালা করার জন্য তালাকদাতার বক্তব্য বা জবানবন্দি গ্রহণ করে তার ওপর পর্যালোচনা করা আবশ্যক। তালাকের ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চারণভেদে হুকুম নির্ণয় করাই সবচেয়ে জটিল বিষয়। পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে বা লিখে তালাক দিয়ে থাকে মৌলিকভাবে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সরীহ ও কেনায়া। সরীহ বলতে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট শব্দ বোঝায়, আর কেনায়া বলতে দ্ব্যর্থবোধক তালাকের ইঙ্গিতবাহী শব্দ বোঝায়।

দ্ব্যর্থহীন তালাক :

সরীহ বা দ্ব্যর্থহীন তালাক বলা হয়, যাতে এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যেটা সাধারণত তালাকের অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং লোকসমাজে এর দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদই বুঝে থাকে। যেকোনো দেশের যেকোনো ভাষাই হোক না কেন তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। শব্দটি মুখে উচ্চারণ করা হোক বা লিখে দেওয়া হোক। এমনকি কোনো সমাজে যদি নির্দিষ্ট কোনো ইশারা দ্বারা তালাকই বোঝানো হয়ে থাকে তবে এমন ইশারা দ্বারাও সরীহ তালাক কার্যকর হবে।

قد مر ان الصريح مالم يستعمل الا فى الطلاق من اى لغة كانت۔ (رد المحتار ٣/٩٩٢)

واراد بـ "ما" اللفظ او ما يقوم مقامه من الكتاب المستبينة او الاشارة المفهومة۔ (رد المحتار ٣/٢٤٧)

আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ :

তালাক শব্দ ছাড়াও আমাদের সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন–ছেড়ে দেওয়া, আযাদ করে দেওয়া বা তিন কথা বলে দেওয়া ইত্যাদি শব্দ অঞ্চলভেদে ব্যবহার হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো স্বামী যদি নিজ স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে ছেড়ে দিলাম' তবে এর দ্বারা একটি সরীহ তালাক কার্যকর হবে। অনুরূপ কেহ যদি স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে আযাদ করে দিলাম' সে ক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। অথবা যদি স্বামী এক কথা/দুই কথা/তিন কথা বলে দেয় এর দ্বারাও সামাজিক প্রচলন হিসেবে সরীহ তালাক পতিত হবে। শুধু বাংলা ভাষাই নয় বরং অন্য কোনো ভাষার কোনো শব্দও যদি আমাদের সমাজে তালাকের অর্থে ব্যবহার হয় তবে সেটাও সরীহ তালাকের পর্যায়ভুক্ত হবে। যেমন ডিভোর্স শব্দটি বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে বর্তমানে ব্যাপক আকারে প্রচলিত রয়েছে। এর দ্বারা সবাই তালাক দেওয়া-নেওয়া বুঝে থাকে। তাই এটা সরীহ বা দ্ব্যর্থহীন শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। কেহ যদি স্ত্রীকে বলে তোমাকে ডিভোর্স দিলাম, তবে এর দ্বারা একটি সরীহ তালাক পতিত হবে।

اما الصريح : فهو اللفظ الذى لا يستعمل الا فى حل قيد النكاح (بدائع الصنائع ٣/١٦١)

فان سرحتك كناية لكنه فى عرف الناس غلب استعماله فى الصريح فاذا قال "رها كردم" اى سرحتك يقع به الرجعى مع ان اصله كناية ايضا۔ وما ذلك الا لانه غلب فى عرف الناس استعماله فى الطلاق وقد مر ان الصريح مالم يستعمل الا فى الطلاق من اى لغة كانت (رد المحتار ٣/٢٩٩)

اذا قال الرجل لامرأته : بهشتم ترا از زنى" فاعلم ان هذه اللفظة استعملها اهل خراسان واهل العراق فى الطلاق وانه صريحة عند ابى يوسفؒ كان الواقع بها رجعيا ويقع بدون النية وفى الخلاصة وبه اخذ الفقيه ابو الليث وفى التفريد وعليه الفتوى (التاتار خانية ٤/٦٤٣)

দ্ব্যর্থহীন তালাক দুই প্রকার :

তালাকে সরীহ বা দ্ব্যর্থহীন তালাক দুই প্রকার। রজঈ ও বায়েন।

প্রথম প্রকার : যদি দ্ব্যর্থহীন শব্দটি তালাক বা স্পষ্টভাবে তালাক বোঝায় এমন আঞ্চলিক কোনো শব্দে স্ত্রীর সাথে নির্জন বাসের পর কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া দেওয়া হয় এবং তিন সংখ্যার উল্লেখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে না করা হয় এবং বায়েন হওয়ার মতো অন্য কোনো বিশেষণ প্রয়োগ না করা হয় তবে তা দ্ব্যর্থহীন রজই তালাক হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার : পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ এর বিপরীত করা হলে অর্থাৎ বায়েন শব্দ প্রয়োগ করা হলে বা তালাক শব্দের সাথে তিন সংখ্যার উল্লেখ করে ফেললে, অথবা সহবাস বা নির্জন বাসের পূর্বেই তালাক দিলে কিংবা তালাকের সাথে সাথে বায়েন হওয়ার মতো কোনো বিশেষণ যোগ করে দিলে তা দ্ব্যর্থহীন বায়েন তালাক হিসেবে ধর্তব্য হবে।

يتزوجها فى العدة وبعد انقضائها (عالمكيرى ١/٤٧٢، هداية ٢/٣٩٩) فاذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه (فقه السنة ٨/٧٩)

মুগাল্লাজ : তালাক রজঈ হোক বা বায়েন যদি এর সাথে তিন সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয় বা তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করা হয়। যেমন–তালাক, তালাক, তালাক/এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক/ এক, দুই, তিন/ তিন তালাক দিলাম/ এক তালাক, দুই তালাক, বাইন তালাক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রত্যাহার বা বিবাহ নবায়নের সুযোগ থাকে না।

وان كان الطلاق ثلاثا فى الحرة وثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها (هندية ١/٤٧٣)

ভবিষ্যতের তালাক :

তালাক কার্যকর হতে হলে অতিত বা বর্তমান কাল ব্যবহার করে তালাকের শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। ভবিষ্যতে হওয়া বোঝায় এমন শব্দে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। যেমন–কেহ বলল, তালাক দিয়ে দেব/ ছেড়ে দেব/ তালাক দিতে চাই/ আমি তার সাথে থাকব না/ আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব/তালাক দিতে ইচ্ছুক/ মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের তালাকের ব্যবস্থা করে দিন ইত্যাদি শব্দে তালাক হবে না।

بخلاف كنم لانه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك۔۔۔ لو قال بالعربية اطلق لايكون طلاقا (هندية ١/٣٨٤)

وقال طلقك لم يقع (سكب الانهر فى شرح ملتقى الابهر ١/٣٨٧)

انا اطلق نفسى لم يقع لانه وعد (درمختار ٤/٥٥٩)

لوقال اردت طلاقك لايقع (خانية على الهندية ١/٤٥٢)

ঝুলন্ত তালাক :

হবে না।

عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: ٢٢٩) قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (المصنف لابن ابى شيبة ١٩٢١٩)

واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها فى العدة رضيت بذلك اولم ترض (هداية ٢/٣٩٤)

রজঈ ও বায়েনের উদাহরণ :

রজঈ : যে স্ত্রীর সাথে সহবাস বা নির্জন বাস হয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করে যদি উচ্চারণ করা হয় বা লেখা হয় তালাক দিলাম/ তুমি তালাক/ এক তালাক/ দুই তালাক/ ছেড়ে দিলাম/ মুক্ত করে দিলাম/ আযাদ করে দিলাম তাহলে তালাকে রজঈ পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে ইদ্দতের মাঝে মৌখিক ঘোষণা বা স্বামী-স্ত্রীসুলভ কোনো আচরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ আছে। আর যদি ইদ্দত পার হয়ে যায় তবে মোহর ধার্য করে বিবাহ নবায়নকরত সংসার করার সুযোগ রয়েছে।

বায়েন : ওপরে উল্লিখিত শব্দগুলো যে স্ত্রীর সাথে এখনো সহবাস বা নির্জনবাস হয়নি তাকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করলে বা লিখলে বায়েন তালাক হবে। অথবা নির্জনবাস/ সহবাসকৃত স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বায়েন দিলাম/ তুমি বায়েন/ বাইন তালাক দিলাম বলা হলে বায়েন তালাক হবে। তদ্রূপ রজই তালাকের ইদ্দতের মাঝে প্রত্যাহার/ রজয়াত না করাবস্থায় ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে বায়েন তালাক হবে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে চাইলে মোহর ধার্যকরত বিবাহ নবায়ন করতে হবে।

اذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان

ففى البدائع ان الصريح نوعان صريح رجعى وصريح بائن۔ فالاول : ان يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاولا اشارة الخ۔ واما الثانى : فبخلافه وهو ان يكون بحروف الابانة وبحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة او بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا او اشارة الخ (رد المحتار ٣/٢٥٠)

দ্ব্যর্থহীন তালাকের হুকুম :

দ্ব্যর্থহীন সরীহ তালাকের সাথে দুই ধরনের হুকুম সম্পৃক্ত। প্রথমত, এর দ্বারা তালাক কার্যকর হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গ। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কার্যকর হতে কোনোরূপ অন্তরায় থাকে না। তালাক হওয়া নিশ্চিত। তালাকের নিয়্যাত থাক বা না থাক। বুঝেশুনে দেওয়া হোক বা না বুঝে রাগের মাথায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় ভয় দেখানোর জন্য বা মজাক-মশকরা করে দেওয়া হোক–সর্বাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে।

ولا يحتاج الى نية لان الصريح موضوع للطلاق شرعا، فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية (مجمع الانهر ١/٣٨٦)

ولا يفتقر الى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال (هداية ٢/٣٥٩)

দ্বিতীয়ত, তালাক কার্যকর হওয়ার পর রজয়াত বা সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সুযোগসংক্রান্ত বিধান। এখানে দ্ব্যর্থহীন সরীহ তালাকের প্রকারভেদে হুকুম ভিন্ন হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে এটা দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। রজঈ ও বায়েন। দ্ব্যর্থহীন তালাক যদি রজঈ হয়ে থাকে তবে রজয়াত সম্ভব হবে। অর্থাৎ মৌখিক ঘোষণা বা স্বামী-স্ত্রীসুলভ কোনো আচরণের মাধ্যমে পুনর্মিলন ঘটানো যাবে। এবং বায়েন হয়ে থাকলে

পুনর্মিলন বিবাহ নবায়ন করা লাগবে। আর যদি তা মুগাল্লাজ তথা তিন সংখ্যাযুক্ত হয়ে থাকে তবে শরয়ী হালালা ছাড়া সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সম্ভব

কোনো শর্তের সাথে তালাক ঝুলন্ত রাখা হলে শর্তটি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে তালাক কার্যকর হবে, এর আগে নয়। যেমন–কেহ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি বাপের বাড়ি যাও তালাক/ নব্বই দিনের ভেতর নোটিশের জবাব না দিলে তালাক। এ ক্ষেত্রে বাপের বাড়ি গেলে তালাক হবে, অন্যথায় হবে না। অনুরূপ নব্বই দিনের ভেতর জবাব না দিলে তালাক হবে, অন্যথায় হবে না।

فاذا اضاف الى شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لامرأته: ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق (هداية ٣٨٥/٢)

তালাক থেকে বাঁচার কৌশল :

শর্তযুক্ত তালাক শর্তটি পাওয়া গেলে কার্যকর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার অবকাশ নেই। স্বামী অনুমতি দিলেও হবে না। যেমন–স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তিন তালাক। এরপর যদি স্বামী প্রবেশের অনুমতিও দেয় বা তালাক উঠিয়ে নেয় তবুও কাজ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে তিন তালাক থেকে বাঁচার কৌশল হচ্ছে, স্ত্রীকে একটি বায়েন তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করা। এরপর শর্ত ভঙ্গ করে একবার ঘরে প্রবেশ করে নেবে। এরপর স্ত্রীকে কোনোরূপ হালালা ব্যতীতই শুধু মোহর ধার্য করে বিবাহ করে নেবে। এরপর ওই ঘরে প্রবেশ করতে আর কোনো বাধা থাকবে না। প্রবেশ করলে অতিরিক্ত কোনো তালাক হবে না।

وان وجد فى غير الملك انحلت اليمين بان قال لامرأته: ان دخلت الدار فانت طالق فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة ثم دخلت الدار تنحل اليمين ولم يقع شئ (هندية ٤١٦/١)

তালাকের পর ইনশাআল্লাহ বলা :

স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাক উচ্চারণের পর বিলম্ব না করে সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলা হলে তালাক হবে না। নিঃশ্বাস গ্রহণের বিরতি, হাঁচি, কাশি বা হাই তোলার কারণে বিলম্ব হলে বা তোতলামির কারণে উচ্চারণে দেরি হলে তা বিলম্ব হিসেবে ধর্তব্য হবে না। অতএব কেহ যদি স্ত্রীকে বলে 'তুমি তালাক ইনশাআল্লাহ' তবে এর দ্বারা তালাক পতিত হবে না। অনুরূপ ইনশাআল্লাহ শুরুতে আনা হলে অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ তুমি তালাক' বলা হলে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে তালাক হবে না।

(قال لها انت طالق ان شاء الله متصلا) الا لتنفس او سعال او جشاء او عطاس او ثقل لسان او امساك فم ـــ صح الاستثناء (الدر المختار مع الشامى ٦١٦/٤)

لوقال: ان شاء الله انت طالق لاتطلق فى قول ابو يوسفؒ وتطلق فى قول محمدؒ والفتوى على قول ابى يوسفؒ (البحر الرائق ٣٩/٤)

واذا قال الرجل لامرأة: انت طالق ان شاء الله فله استثناء ه ولا طلاق عليه (سنن دار قطنى رقم ٣٩٣٩)

বারবার উচ্চারণ :

তালাক শব্দটি একাধিকবার উচ্চারণ করে তালাক, তালাক, তালাক বলে দিলে সব কটি তালাক কার্যকর হবে–এটাই মূল বিধান। তবে স্বামী যদি বলে, শুধু প্রথম এক তালাক আমার উদ্দেশ্য বাকি শব্দগুলো এর তাগিদের জন্য বলেছি এবং বাস্তবেও বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা (আল্লাহর আদালতে) এক তালাক পতিত হবে।

كرر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التأكيد دين (در مختار ٢٩٣/٣)

رجل قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق وقال عنيت بالاولى الطلاق بالثانية والثالثة وفهامها صدق ديانة (الفتاوى التاتار خانية ٤٢٩/٤)

কিন্তু দুনিয়ার কোনো আদালতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আদালত এ ক্ষেত্রে তিন তালাকের ফয়সালাই প্রদান করবেন। ঠিক স্ত্রী যখন এমন তিন তালাকের কথা জানতে পারবে বা নিজে শুনবে তবে স্বামীর নিয়্যাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তার কর্তব্য হবে এটাকে তিন তালাক ধরে নিয়ে যেকোনোভাবে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। স্বেচ্ছায় ওই স্বামীর সাথে সংসার করা স্ত্রীর জন্য বৈধ হবে না।

اى وقع الكل قضاء (شامى ٢٩٣/٣)

اذا سمعته او خبرها عدل لا يحل تمكينه (رد المحتار)

والتاكيد خلاف الظاهر وعلمت ان المرأة كالقاضى لايحل لها ان تمكنه اذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه (شامى، فتاوى دار العلوم ديوبند ٢٠٩/٩)

তালাকের সংবাদ প্রদান :

তালাক প্রদানের পর যদি ঘটনার সংবাদ বিভিন্ন লোককে দেয় বা ওই তালাকের নোটিশ লিখে বা এর এফিডেভিট নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে লেখায় এমতাবস্থায় নতুন সূত্রে তালাকের নিয়্যাত না থাকায় ভিন্ন কোনো তালাক হবে না।

ولو طلقها ثم قال لها: طلاق داده است لا تقع اخرى (هندية ٣٥٦/١)

ولو قال لامرأته انت طالق فقال له رجل: ماقلت ؟ فقال طلقتها او قال قلت هى طالق فهى واحدة فى القضاء (هندية ٣٥٥/١)

لان كلامه انصرف الى الاخبار بقرينة الاستخبار (بدائع الصنائع ١٦٣/٣)

তালাকের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য :

স্ত্রী দাবি করছে তিন তালাকের আর স্বামী বলে আমি এক/দুই তালাক দিয়েছি। এমতাবস্থায় দেখতে হবে স্ত্রীর দাবির সপক্ষে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে স্বামী হলফ করে দাবি করলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছাকৃত মিথ্যার

তালাকের নিয়্যাত করা, স্ত্রীর তালাক চাওয়ার প্রতিউত্তরে ওই কথা বলা অথবা পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হওয়া, যার দ্বারা তালাক বোঝা যায়। অতএব তোমার সাথে আজ থেকে সম্পর্ক নাই/ চলে যাও/ বাপের বাড়ি চলে যাও/ শেষ করে দিলাম/ ফয়সালা করে দিলাম/ পৃথক করে দিলাম/ জবাব দিয়ে দিলাম/ সংসার করব না/ তুমি আমার মা-বোনের মতো/ আমি তোমার স্বামী নই ইত্যাদি তালাকের ঈঙ্গিতবাহী শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামী তালাকের নিয়্যাত করলে বায়েন তালাক হবে। আর যদি হলফ করে বলে তালাকের নিয়্যাত ছিল না তাহলে কোনো তালাক হবে না। অথবা স্ত্রী যদি বলে আমাকে তালাক দিয়ে দাও। উত্তরে স্বামী বলে শেষ করে দিলাম। তবে নিয়্যাত ছাড়াই এখানে তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। দ্ব্যর্থক শব্দে তালাকে বায়েন হওয়ার পর পুনঃসংসার করার নিয়ম পূর্বে বায়েন তালাকের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

واما الضرب الثانى وهو الكنايات لايقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة الحال (هداية ٢/٣٨٩)

ولو قال لها لانكاح بينى وبينك او قال لم يبق بينى وبينك نكاح يقع الطلاق اذا نوى (هندية ١/٣٧٥)

اذهبى وتزوجى لايقع الا بالنية وان نوى فهى واحدة بائنة (شامى ٣/٣١٤)

لاتحتمل المذاكرة من الرد والتبعيد فترجح جانب الطلاق ظاهرا فلا يصدق فى الصرف عنه فلذا وقع بها قضاء بلا نية۔ (شامى ٤/٥٣٣)

وفى كل موضع يصدق الزوج على نفى النية انما يصدق مع اليمين لانه امين فى الاخبار عما فى ضميره والقول قول الامين مع اليمين۔ (فتح القدير ٤/٧٣)

লিখিত তালাক :

তালাক মুখে উচ্চারণ করলে যেভাবে হয়ে যায় তদ্রূপ লিখিতভাবে দিলেও

(বাকী অংশ ২৫ পৃ.দ্র.)

আশ্রয় নিলে ওই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। স্ত্রী যদি তিন তালাকের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তবে স্বেচ্ছায় তার সাথে সংসার করা বৈধ হবে না। যেকোনোভাবে বিরত থাকবে।

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق (هداية ٢/٣٢٦)

جب کہ زید تین طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اور زوجہ کے پاس تین طلاق کے گواہ نہیں ہیں تو قول زید کا اس بارہ میں معتبر ہے (فتاوی دار العلوم دیوبند ۹/۱۹۳)

لیکن ہندہ کو اگر یقین ہے کہ اس کے شوہر نے الفاظ مذکورہ بالا کہے تھے تو اس کے حق میں حرمت ثابت ہوگئی اسکو چاہئے کہ شوہر سے علیحدہ رہے اور بدون حلالہ کے اس سے نکاح نہ کرے۔ کیونکہ المرأۃ کالقاضی کتب فقہ میں مذکور ہے۔ (فتاوی دار العلوم ۹/۲۲۵)

তালাকের সংখ্যা নিয়ে সংশয় :

তালাক দেওয়া নিশ্চিত; তবে সংখ্যা নিয়ে যদি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় তবে ছোট সংখ্যা ধর্তব্য হবে যেহেতু সেটা নিশ্চিত। অতএব এক আর দুই নিয়ে সন্দেহ হলে এক তালাক হবে। দুই আর তিনের মাঝে সন্দেহ দেখা দিলে দুই তালাক হবে। তবে যদি বড় সংখ্যার ব্যাপারে কোনোভাবে সে নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা জন্মায় এবং মনের ঝোঁকও সেদিকে থাকে তাহলে সে অনুযায়ী ফয়সালা করতে হবে। তথা ওপরের উদাহরণে যথাক্রমে দুই এবং তিন তালাক কার্যকর হবে।

ولوشك اطلق واحدة او اكثر بنى على الاقل وفى الشامية الا ان يستيقن بالاكثر او يكون اكبر ظنه (الدر المختار مع الشامى ٣/٢٨٣)

وان قال الزوج عزمت انه ثلاث يتركها وان اخبره عدول حضروا ذلك بانها واحدة وصدقهم اخذ بقولهم (الاشباه والنظائر ١٠٨)

اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی لیکن اگر دو یا تین میں شک ہے تو دو طلاق سمجھیں جاویں گی (فتاوی دار العلوم دیوبند ۹/۲۵۰)

বাক্‌প্রতিবন্ধীর তালাক :

মুখে তালাক উচ্চারণে অক্ষম জন্মগত প্রতিবন্ধীর তালাকের ক্ষেত্রে তার পরিচিত ইশারা, যার মাধ্যমে সে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে–এমন ইশারায় তালাক বোঝাতে সক্ষম হলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে ইশারার সাথে সাথে লিখিত দেওয়া হলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

او اخرس ولو طاريا ان دام للموت به يفتى الخ واستحسن الكمال اشتراط كتابته باشارته المعهودة فانها تكون كعبارة الناطق استحانا (الدر المختار مع الشامى ٣/٢٤٠، فتاوى دار العلوم ديوبند ٩/١٢٦)

স্ত্রী শ্রবণ করা শর্ত নয় :

তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য স্ত্রীকে সামনে উপস্থিত থাকা বা তাকে শুনিয়ে তালাক উচ্চারণ করা শর্ত নয়। অতএব দূর থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, ই-মেইল, মেসেজ বা মোবাইলে তালাক দিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে। অনুরূপ স্ত্রীর অজান্তে দিলেও তা হয়ে যাবে। তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য স্বামীর স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট, স্ত্রী বা অন্য কোনো সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি নয়।

عن الحسن وخلاس: فى الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر (المصنف لابن ابى شيبة رقم ١٩٢٦٥)

اما بعد: فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة (شامى ٣/٢٤٦)

দ্ব্যর্থক তালাক :

তালাকে কেনায়া, অর্থাৎ দুই ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে–এমন অস্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়া হলে তা কার্যকর হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। স্বামী

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৯

মাওলানা কাসেম শরীফ

সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতির সাধারণ ত্রুটি : শিক্ষার অর্থ জানা, বোঝা বা হৃদয়াঙ্গম করা। অজানাকে জানা, অবোধ্যকে বোঝা আর অশেখাকে শেখা। শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে। তাই শিক্ষা মানুষের জন্য অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, মানুষ জন্তু-জানোয়ারের একটি পরিবর্তিত স্তর বৈ আর কিছু নয়! ভোগের সংসারে বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার জন্য যত ইচ্ছা, ভোগবিলাস করে যাও।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ একটি নৈতিক জীব। নৈতিকতাই তার বৈশিষ্ট্য। তাই তার জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে থাকবে নীতিবন্ধন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অনেক বিষয়েই জ্ঞান আহরণ করতে হবে, জানতে হবে অনেক কিছু। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কোথাও নৈতিকতা হারালে চলবে না। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাকে রাজনীতি চর্চা করতে হবে। তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে তাকে অর্থনীতির চর্চা করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। এ ধরনের অসংখ্য প্রয়োজনে অসংখ্য শাস্ত্র তার অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু সব কিছু আলোচনা ও চর্চা হতে হবে ওই একই জীবন দর্শনের ভিত্তিতে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার প্রথম শ্রেণী থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু পড়ানো হয়, তাতে ইসলামের জীবন দর্শন আদৌ প্রতিফলিত হয় না।

প্রতিটি বিষয় আলোচনাকালে যদি নৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকে, যদি সেগুলো নৈতিকতার রসে সিঞ্চিত না হয়, তবে শুধু আলাদাভাবে দীনিয়াত বা ইসলামিয়াতের লেজুড় জুড়ে দিলেই সাধারণ শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা হয়ে যায় না। তা বরং কাকের পুচ্ছে ময়ূরের পালক জুড়ে দেওয়ার মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের সংমিশ্রণে হিতে বিপরীত ফলই হয়ে থাকে। এর ফলে ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পায় না। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে দেখানো হয় এ বিশ্ব-চরাচরে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো বাদ দিয়েও আমরা সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীকে এ কথাই শিখিয়ে দেওয়া হয় আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের কোনো অস্তিত্ব নেই, আর থাকলেও তাদের কোনো প্রভাব মানব জীবনে নেই। যেন পরোক্ষভাবে বোঝানো হয়, মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকারী। আল্লাহকে যদি একান্তই মানতে হয়, তবে তাঁকে আকাশরাজ্যেই স্থান দাও, জমিনে তাঁর কোনো প্রভুত্ব নেই।

নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষায় কেবল ভোগবাদিতাই গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নয়নের বালাই নেই সেখানে। গবেষক আহমদ রফিক লিখেছেন : "শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি আজকের নয়, বহুদিন থেকে চলছে এ বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা, করণীয় ও সমাধানের সূত্র বিবেচনা। একটি জাতিকে যথাযথ মানদণ্ডে শিক্ষিত করে তোলার বিকল্পহীন শর্ত হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক ভিতটা মজবুত করে গড়ে তোলা, আর সে লক্ষ্য অর্জনের অপরিহার্য দিক হচ্ছে উত্তম শিক্ষক, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ও শিক্ষার অর্থনৈতিক সহজলভ্যতা।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, এ পর্বটি ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্তত শিক্ষার উত্তম ভিত তৈরির ক্ষেত্রে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্বেই দুর্বলতা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। আর সেটা হলো শিক্ষার্থীর কাঁধে চাপানো গুরুভার বোঝাটির মতো তার মস্তিষ্ক কোষেও ভার চাপানো, গ্রহণ ক্ষমতার মাত্রা বিবেচনা না করে। আর পড়াশোনা থেকে আহরিত জ্ঞান যেমনই হোক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে 'কোচিং', আগে যা পরিচিত ছিল 'প্রাইভেট' পড়ানো হিসেবে।

শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার ক্ষেত্রে, এর বাণিজ্যিক চরিত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক -মতাদর্শিক ধারণা ও বাস্তবতা (কনসেপ্ট) নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে যেকোনো স্তরে শিক্ষার মান যতই উন্নত হোক এর পণ্য চরিত্র সেসব স্থানে তেমনি উচ্চমাত্রার। পরিবার বা নাগরিকের মাথাপিছু আয়ের

ওপর নির্ভর করে তার উচ্চশিক্ষা বা উত্তম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বা যোগ্যতা ও সম্ভাবনা।

শিক্ষার বাণিজ্যিক চরিত্রটি একালের দান, বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা খাতের চরিত্র বদল ঘটার পর থেকে। 'সামাজিক ব্যবসা' কথাটা এ ক্ষেত্রে নীতি হিসেবে বিশাল প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা ও মুনাফার যে সাধারণ রূপ আমরা দেখি, তা আদর্শিক রূপ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য খাতের মতো বহু দিকে বিস্তার লাভ করেছে। করেছে বিশেষভাবে ইংরেজি মাধ্যমে শিশু স্তর (কিন্ডারগার্টেন) থেকে স্কুল, কলেজ হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। শিক্ষা সেখানে অনেক অনেক দামে বিকোয়।

সাধারণ শিক্ষার বাইরে উদাহরণ টানতে গেলে কারিগরি শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের কথা সবারই মনে পড়বে। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে পণ্য মূল্যেরও বৃদ্ধি ঘটে, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, মুনাফারও মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণ, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো। এগুলো যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে স্থাপিত, সে কথা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ব্যবসায়ীকুল অস্বীকার করে না। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী বা শিক্ষার পাঠ শেষ করে আসা চিকিৎসক ভাবতে পারেন না কী উচ্চমাত্রার বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তিমূল্য এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়। বাংলাদেশেও যে শিক্ষার ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে গেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সবই বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আদর্শের প্রভাব ও ফলাফল হিসেবে বিবেচ্য।" (দৈনিক কালের কণ্ঠ : ১৮-০২-২০১৬ ইং)

অর্থ দিয়ে যেহেতু জ্ঞান অর্জন, তাই অর্থ উপার্জনই প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য। এ জন্য চাকরিই সাফল্য, অর্থ উপার্জনই শেষ কথা। তাই চাকরি না পেলে জীবন শেষ! ষোলো আনাই মিছে! এ বিষয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠের আরো একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ কালের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে–'শিক্ষিতদের চাকরি নেই!' সেখানে বলা হয়েছে, একটু ভালো থাকার আশায় প্রয়োজনে ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি, জমিজমা বিক্রি করে হলেও সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পিছপা হন না এ দেশের মা-বাবারা। কিন্তু সন্তানের শিক্ষাজীবন শেষে তার ওপর যখন পুরো সংসারের ভার দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন তাঁরা, তখন দীর্ঘশ্বাস যেন আরো দীর্ঘ হয়। কারণ চাকরি নেই; কর্মসংস্থান নেই। তাই নির্ভরতার বদলে উচ্চশিক্ষিত সন্তানটি তখন হয়ে উঠছেন আরো বড় বোঝা। বরং কম শিক্ষিত ও অশিক্ষিতরা কোনো না কোনো কাজ পাচ্ছে; আর সমাজে নিগ্রহের পাত্র হয়ে হতাশায় ডুবছেন উচ্চশিক্ষিতরা।

অনলাইনে চাকরির বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান 'বিডিজবস'-এর সিনিয়র ব্যবস্থাপক মো. শামীম হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রতিদিন তাঁদের ওয়েবসাইটে এক লাখ ২০ হাজার একক গ্রাহক (একজন একাধিকবার ব্রাউজ করলেও একজন হিসাবে) চাকরি খোঁজে। চাকরিদাতাদের নজর কাড়তে সাইটটিতে রেজিস্ট্রেশন করে জীবনবৃত্তান্ত রেখে দিয়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত বেকার। তিনি বলেন, রেজিস্ট্রেশন করাদের ৭০-৮০ শতাংশই একেবারে নতুন, অনার্স-মাস্টার্স শেষ করা, যাঁরা প্রথমবারের মতো চাকরি খুঁজছেন। বাকি ২০-৩০ শতাংশ চাকরিজীবী রয়েছেন, যাঁরা আরো ভালো চাকরি খুঁজছেন।

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু স্নাতক বেকারের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনো দেশে এত বেশি উচ্চশিক্ষিত বেকার নেই। তাদের হিসাবে, আফগানিস্তানে এ হার ৬৫ শতাংশ। ভারতে ৩৩, নেপালে ২০, পাকিস্তানে ২৮ ও শ্রীলঙ্কায় ৭.৮ শতাংশ। বেকারদের মধ্যে কলা ও মানবিক বিষয়ে অধ্যয়নকারী উচ্চশিক্ষিতরাই বেশি। বাংলাদেশে ভালো চাকরির আশায় প্রতিবছরই উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র বাড়ছে না। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল আট লাখ ২১ হাজার ৩৬৪ জন। আর ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ আট হাজার ৩৩৭ জনে। (দৈনিক কালের কণ্ঠ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)

কিন্তু সেসব ভাগ্যবানের কী অবস্থা, যাঁরা চাকরি নামের সোনার হরিণ পাচ্ছেন, তাঁরা কতটা দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করছেন, নাকি তাঁরা আখের গোছাচ্ছেন? একাধিকবার বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। এর সঙ্গে কারা জড়িত? অশিক্ষিতরা? হুজুররা? কারা জড়িত? ওই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরাই। বলা যায়, এটাও ইংরেজদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার কুফল। আগে আমরা উল্লেখ করেছি, ইংরেজরা নিজেদের আমলা-কামলা শ্রেণী সৃষ্টির জন্যই নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু

করেছে। তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ করেছে। ড. আকবর আলী খান লিখেছেন : 'অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এ দেশে নিকৃষ্ট প্রাণী জাত সাদৃশ্য মানব সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ শাসন আমলে। বেশির ভাগ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বদ্ধ ধারণা হলো, ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে দুর্নীতি, অন্তত ব্যাপক দুর্নীতি ছিল না। তাঁদের মতে ইংরেজ শাসকরা সাধারণত (প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজ বিজেতারা ছাড়া) নিজেরা দুর্নীতিপরায়ণ না হলেও তারা যে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে, তা এ দেশে ব্যাপক দুর্নীতির সৃষ্টি করে।' (পরার্থপরতার অর্থনীতি, পৃ. ১২)

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় চারিত্রিক অধঃপতন কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, দৈনিক মানবজমিনের একটি প্রতিবেদন দেখুন : 'উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির উচ্চ হার' (৯ মে ২০১৬)। সেখানে বলা হয়েছে, ইউএনউইমেনের এক জরিপের তথ্য মতে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৮৭% ছাত্রী কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্লীল কথাবার্তা বা কটূক্তির মুখোমুখি হন তাঁরা। কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। সচেতনতারও অভাব রয়েছে। রয়েছে অবক্ষয়। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালমা আলী মানবজমিনকে জানান, আইন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন আইন পাসের আগ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশও আইনের সমান। তা ছাড়া এসব বিষয়ের বিচারের জন্য নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ অন্য অনেক আইনের সহায়তা নেওয়া যায়। কিন্তু সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক ক্যাম্পেইন জরুরি। সেখানে সরকারকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার।

কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আরবি বিভাগের শিক্ষক এস এম রফিকুল আলমের চাকরি গেছে একই ধরনের অভিযোগে। পরিসংখ্যান বিভাগের চন্দন কুমার পোদ্দার জেল খেটেছিলেন গৃহকর্মীকে যৌন হয়রানি করার মামলায়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তরুণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল এক কলেজছাত্রীকে সিএনজি অটোরিকশায় যৌন হয়রানির জন্য। ওই শিক্ষার্থী ফেসবুকে এ ঘটনা প্রকাশ করার পর বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। কিন্তু যৌন নিপীড়নবিরোধী তদন্ত সেলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাখিল না হওয়ায় তদন্তের মুখোমুখি হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যান ওই শিক্ষক। চবির অন্তত তিন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে গত তিন বছরে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্তি ভোগ করেছেন নাট্যতত্ত্ব বিভাগ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দুই শিক্ষক। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের এক শিক্ষককে করা হয়েছে বরখাস্ত। বহিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছু শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি কামরুল হাসান মজুমদারকে শাস্তিস্বরূপ বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় ২০১৫ সালে। গত চার বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতাধিক যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ২০১২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক শাওন উদ্দিনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর আগে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক জুলফিকারুল আমীনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আট বছর মেয়াদে তিন ধরনের শাস্তির সুপারিশ করে তদন্ত সেল। সে অনুসারে, ওই শিক্ষককে অভিযোগকারী শিক্ষার্থীর পরীক্ষাসংক্রান্ত কোনো কাজে কখনোই যুক্ত হওয়া, তিন বছরের জন্য বিভাগের কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ও গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছাত্রীকে গানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় যৌন হয়রানির দায়ে টিএসসির প্রশিক্ষক সানোয়ার হোসেন বরখাস্ত হন। সমাজবিজ্ঞানের এক শিক্ষককেও শাস্তির সুপারিশ করে কমিটি। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে অন্তত দশটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি অভিযোগের তদন্ত শেষে শাস্তির সুপারিশ করেছিল তদন্ত কমিটি। কিন্তু সেই অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। বরং তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগেই বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে যৌন নিপীড়নের যেকোনো ঘটনার বিচার এড়াতে নানা মহলের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে যৌন হয়রানির ঘটনায় সৃষ্ট তুমুল আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন। সেই দাবির প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে এক রিট আবেদনের বিপরীতে আদালতের রায়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির রিরুদ্ধে একটি তদন্ত সেল গঠনের আদেশ দেওয়া হয়। (মানবজমিন : ৯ মে

২০১৬)

বাংলাদেশে অবাধ প্রেম ও প্রণয় নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ নয় বেশ্যাবৃত্তিও। কাজেই সন্তুষ্টচিত্তে কিছু করা হলে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তা অপরাধ নয়। নিষিদ্ধ শুধু ইভ টিজিং বা জোর করে কিছু করা। সেটাও কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, দেখুন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৮০১ জন, ১০১৪ জন, ৬৪৫ জন, ৪৭০ জন, ৪৪৪ জন এবং ৩২৮ জন নারী ও শিশু উত্ত্যক্তের শিকার হয়। এ ছাড়া পাঁচ বছরে উত্ত্যক্তের কারণে আত্মহত্যা করেছে ১৩৭ জন নারী ও শিশু। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে উত্ত্যক্তের ঘটনা ঘটেছে ২০৮টি। উত্ত্যক্তের কারণে আত্মহত্যা করেছে ৮ জন। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে মোট ২৫ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন আত্মহত্যা করেছেন এবং একজন নিহত হয়েছেন। (মানবজমিন : ২৬ অক্টোবর, ২০১৬)

কারা এর সঙ্গে জড়িত, এর জবাবে একটি আর্টিক্যাল ছেপেছে দৈনিক ইত্তেফাক। সেখানে লেখার শিরোনামই দেওয়া হয়েছে–'শিক্ষিত ছেলেরাই বেশি করছে ইভটিজিং'। (ইত্তেফাক : ২৫ জুন, ২০১৩)

সন্দেহ নেই যে এখানে শিক্ষিত বলতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

এর জন্য মূলত দায়ী হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা মানে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই একই বিষয়, একই কক্ষে পাশাপাশি বসিয়ে শিক্ষা প্রদান। অথচ ছেলে ও মেয়ে জন্মগতভাবেই স্বতন্ত্র দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং ভাবধারার ধারক হয়ে থাকে। জীবনের পরিণত স্তরে স্বাভাবিক দায়িত্ববোধের তাগিদেই তারা স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র গ্রহণে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে কোনো মিলই থাকে না ছেলে ও মেয়ের জীবনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়কে ঠিক একই বিষয় একই ধারায় শিক্ষা দেওয়ার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সমৃদ্ধির বড় সর্বনাশ সাধন হয়েছে। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সুবিদিত যে গ্রিক সভ্যতার পতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীর বেলেল্লাপনা, পুরুষদের সঙ্গে তাদের অবাধ মেলামেশা এবং অতিমাত্রায় প্রকাশ্য সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী। বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ আলেকসিম ক্যারেল ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই Man the Unknown-এ লিখেছেন : 'পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে পার্থক্য, তা মৌলিক পর্যায়ের। তাদের দেহের শিরা, উপশিরা, স্নায়ু সব কিছু ভিন্নরূপ বলেই তাদের এই পার্থক্য বিদ্যমান। নারীর ডিম্বকোষ থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয় তার প্রভাব নারী দেহের প্রতিটি অঙ্গে প্রতিফলিত হয়। নারী ও পুরুষের স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতার কারণও একই।' পুরুষ ও নারী মানুষ হিসেবে অভিন্ন হলেও তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে প্রকৃতি তাদের থেকে পৃথক ধরনের কাজ নিতে ইচ্ছুক। একই ধরনের কাজ প্রকৃতি তাদের কাছ থেকে নেওয়ার পক্ষপাতি নয় এবং এই সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনেই উভয়ের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখা একান্ত জরুরি।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিদ্যা–এ ধরনের সব বিষয়েই যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ হয় না কখনো। কাজেই একই কক্ষে বসিয়ে, একই ভঙ্গিতে একই বই পড়ানো ও একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে একই বিষয় ছেলে ও মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার মানে হলো ছেলে ও মেয়েকে মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন করে তোলা। আর এটা যে স্বভাব ও প্রকৃতির শুধু বিপরীতই নয়, মানবতার পক্ষে মারাত্মকও, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। এর ফলে ছেলেরা মেয়েলী স্বভাব-প্রকৃতির ধারক হবে-পৌরুষ হারিয়ে ফেলবে আর মেয়েরা পুরুষোচিত মন-মেজাজ লাভ করবে, হারিয়ে ফেলবে সব নারীসুলভ কমনীয়তা, তা বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও অনায়াসে বোঝা যায়। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে প্রধানত এ কারণই নিহিত। দ্বিতীয়ত : ছেলে ও মেয়েকে একই কক্ষে বসিয়ে শেখানোর পরিণাম হলো, হয় ছেলে ও মেয়েদের স্বাভাবিক যৌনবোধকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়া এবং মানব সমাজে ক্লীব লিঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটানো, না হয় যৌনবোধের উস্কানি সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনচর্চা ও যৌন পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি–যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধনই ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যাবে। আর মানবাকৃতির এ জীবগুলো এক নতুন পশু শ্রেণীর রূপ ধরে সমাজে পাশবিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। মনে রাখতে হবে, এ

সহশিক্ষা নীতি মুসলিম জাতি কোনো দিনই গ্রহণ করেনি, তারা তা চালুও করেনি। আমাদের নীতিহীন ও চরিত্রহীন ইংরেজ প্রভুরাই এ গোলাম জাতির চরিত্র ধ্বংস করার কুমতলবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে সম্পূর্ণ চরিত্রহীন রূপে গড়ে তোলার চক্রান্ত হিসেবে এ দেশে এ সহশিক্ষার প্রচলন করেছিল। বস্তুত এ সহশিক্ষানীতিতে সত্যিকারের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না কিছুই, বরং সমাজের যুবক-যুবতীদের পশুত্বের নিম্নতম পংকে ডুবে যাওয়ার উৎসাহই দেওয়া হচ্ছে সর্বোতভাবে। সহশিক্ষার নামে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত চলছে নগ্নতা ও বেহায়াপনা, চলছে ভাব বিনিময়, নষ্টামি চর্চা এবং বেলেল্লাপনা। কোথায় তাদের লেখাপড়া? কোথায় তাদের সাহিত্য চর্চা? এগুলো সবই তথাকথিত আধুনিক এবং সহশিক্ষার কুফল। তারা কি জানে না তাদের দেবতুল্য পাশ্চাত্য প্রভুদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে সহশিক্ষার নামে আজ কী চলছে? যৌন নিপীড়নের ঘটনা সেখানকার স্কুল-কলেজগুলোতে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ইউরোপ-আমেরিকান সমাজের 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ২৩% থেকে ৪৪.৮% ছাত্রী ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এখানে সবচেয়ে মর্মাহত হওয়ার মতো ব্যাপার এই যে শিশুরাও যৌন নিপীড়ন থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কানাডার ৫৪% নারী বলছে, তারা ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে (সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩১ জুলাই, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এতে বলা হয় নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোস ও নেদারল্যান্ডসের নারীদের প্রতি তিনজনের একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। (সূত্র : Social Problems. Page-92)

আমাদের সমাজে দৃশ্যমান সহশিক্ষার মৌলিক ক্ষতিকর দিকগুলো নিম্নে দেখানো হলো :

(ক) তরুণ শিক্ষিত প্রজন্মের মধ্যে আল-কুরআনে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ 'যিনা-ব্যভিচার'-এর ব্যাপক চর্চা ঘটছে।

(খ) অবৈধ যৌনাচারের ফলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে নানাবিধ জটিল যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

(গ) সামজে 'ধর্ষণ', 'জারজ সন্তান' এবং 'ভ্রূণ হত্যা' ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

(ঘ) বিপথগামী যুবতীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঙ) যুবক-যুবতীরা শিক্ষাগারে একে অপরের সান্নিধ্যে এসে পরস্পর অবৈধ প্রণয়নের শিকার হচ্ছে।

(চ) তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে 'লিভ টুগেদার' নামক ঘৃণিত পাশ্চাত্য রীতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

(ছ) 'ইভ টিজিং' নামক সামাজিক সমস্যার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে।

(জ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সহজাত আকর্ষণে প্রায়শই ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে।

(ঝ) লাজুক ছাত্রছাত্রীরা এতে অস্বস্তি বোধ করে বিধায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর থেকে তাদের আশানুরূপ ফল আসছে না। (সূত্র : সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০১২)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

(২০পৃষ্ঠার পর)

কার্যকর হয়। চাই নিজ হাতে লেখা হোক বা অন্যের মাধ্যমে। অথবা তালাকনামায় জেনেবুঝে দস্তখত করা হোক। তবে জোরজবরদস্তি করে তালাকনামায় স্বামীর দস্তখত নেওয়া হলে বা সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে পরে তালাক লিখে দিলে কিংবা ধোঁকা দিয়ে স্বামীকে দস্তখত করালে তালাক হবে না। লিখিত তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য স্ত্রীর হাতে পত্র পৌঁছা বা পৌঁছানো জরুরি নয়। বরং তালাক প্রদানের কথা লেখার সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে।

অন্যের হাতে তালাকনামা তৈরির ক্ষেত্রে যদি তালাকের সংখ্যা বলে দেওয়া হয়, বা লেখার পর স্বামী নিজে পড়ে বা শুনে দস্তখত করে তবে লিখিত সংখ্যা অনুপাতে তালাক হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি শুধু তালাকনামা লিখতে বলা হয়, সংখ্যা উল্লেখ করা না হয় এবং লেখাটি সে না পড়ে না শুনে দস্তখত করে দেয় তবে স্বামীর অজান্তে লেখকের পক্ষ থেকে সংখ্যা বৃদ্ধি ধর্তব্য হবে না। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক তালাক কার্যকর হবে। যদিও তালাকনামায় দুই বা তিন তালাক উল্লেখ থাকে।

ثم ان كتب على وجه المرسوم ولم يعلقه بشرط بان كتب اما بعد يافلانة فانت طالق وقع الطلاق عقيب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل لما ذكر نا ان كتابة قوله انت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ بها (بدائع الصنائع ٤/٢٤٠)

وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقر انه كتابه (شامی ٤/٤٥٦)

اگر اس نے وکیل کو تین طلاقیں لکھنے کا حکم نہ دیا ہو اور نہ تین پر رضامندی ظاہر کی ہو تو اب نکاح جدید کافی ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ (کتاب النوازل ۹/۵۱۲)

নববী ইলম অর্জনের ফজীলত ও পাথেয়

মুফতী আশহাদ রশীদী
মহাপরিচালক : জামিয়া কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ, ভারত

উপমহাদেশের বিখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ ভারতের সম্মানিত মহাপরিচালক আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সায়্যিদ আশহাদ রশীদী কর্তৃক মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানের অনুবাদ।

نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفعينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟ "قَالُوا :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ " :اللهُ أَجْوَدُ جُودًا، ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ، وَأَجْوَدُهُمْ مَنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدَهُ "أَوْ قَالَ " :أُمَّةً وَحْدَهُ (شعب الايمان ٢٦٦/٣ حديث رقم ١٦٣٢)

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম ও প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় মেহেরবানি যে তিনি আমাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে ভরপুর কামিয়াব করুন। আফিয়াত ও সুস্থতার দৌলত দান করুন। আপনাদের উত্তম উদ্দেশ্যের মাঝে সফলতা দান করুন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! দুটি বিপরীতমুখী গুণ রয়েছে। একটি হলো বদান্যতা, অপরটি হলো কৃপণতা। একটি গুণ প্রশংসনীয়, অপরটি দোষণীয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটির প্রশংসা করেছেন অপরটির খারাবি বর্ণনা করেছেন। দানশীলের ব্যাপারে তিনি বলেন,

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ যে দানশীল হবে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, মানুষের মনে স্থান করে নেবে, জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন। এর বিপরীত যে কৃপণ হবে তার ব্যাপারে বলেছেন,

وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ،

যে কৃপণতা করবে সে মানুষদের থেকে দূরে সরে পড়বে, জান্নাত থেকে দূরে চলে যাবে আর জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৪/৩৪২ হা. ১৯৬১) আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! উভয় সিফাত আপনাদের সামনে চলে এসেছে। এখন বলুন এর মাঝে কোনটি ভালো? নিশ্চয়ই সাখাওয়াত বা দানশীলতার গুণটিই উত্তম। আপনারা দানশীল হতে চান কি না? দানশীল কাকে বলে? আমাদের সমাজে দানশীল মনে করা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে মানুষের জন্য টাকা-পয়সা বেশি বেশি খরচ করে, এটা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় দানশীল কে?

আপনারা হয়তো মনে করছেন, মাওলানা সাহেব আমাদের দানশীল হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন, অথচ আমাদের পকেট খালি। আমরা তো দরিদ্র। আমরা কিভাবে দানশীল হব? কিন্তু না, আপনারাই সবচেয়ে বড় দানশীল হতে পারেন। তা কী করে হবে বুঝতে হলে এই হাদীস শরীফের মাঝে চিন্তা করতে হবে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মজলিস ছিল, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন

هَلْ تَدْرُونَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟

তোমরা কি জানো সবচেয়ে বড় দানশীল কে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁদের সশ্রদ্ধ জবাবে বললেন اعلم ورسوله الله আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। প্রতিউত্তরে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক. দুই. তিন শ্রেণীর দানশীলের কথা বলেছেন। এর মাঝে আপনারা আছেন কি না চিন্তা করে দেখেন।

সর্বপ্রথম বলেন, الله اجود جودا সবচেয়ে বড় দানশীল রব্বে জুল জালাল মহান আল্লাহ তা'আলা। যিনি আপন-পর সকলকে দান করেন। দোস্ত-দুশমন সকলের পেট ভরেন। যিনি নিজের সম্মুখে মাথা অবনতকারীকেও দান করেন এবং নাফরমানকেও নিরাপত্তা দেন। অতএব পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের

দুশমনদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এরা ভুল কথা বলছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি নাজ-নেয়ামত তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা কী বলেন,

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ,وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ,وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (مريم)

'আমার জন্য কাউকে পুত্র সাব্যস্ত করা এত বড় গোনাহ যে এ কথা শুনে আসমান ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে যায়।'

,وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ

জমিন চৌচির হয়ে যাবে

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

আর পাহাড় নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। এটা এমন খারাপ দাবি। কিন্তু যে সকল লোক এই দাবি করছে এই স্লোগান দিচ্ছে আর এই ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস বক্ষে ধারণ করে আছে, বলুন রব্বে যুল জালাল তাদের পেট ভরে দিচ্ছেন কি না? অতএব দেখুন সবচেয়ে বড় দানশীল কে? যিনি মানুষদের খাওয়ান, জীব-জন্তুদের খাওয়ান, দোস্তকেও খাওয়ান, দুশমনকেও আহার দান করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اللهُ أَجْوَدُ جُودًا

আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বড় দানশীল। তাঁর খাজানা কত বড়? তাঁর কাছে কত শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সকল মানুষের দাবি পূরণ করে যে যা চায় সব দিয়ে দেন, তবুও তাঁর খাজানায় সামান্য পরিমাণ কমবে না।

বিষয়টিকে হাদীসে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। একটি পাখি সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে বসল আর তার ঠোঁট দিয়ে সাগর থেকে পানি পান করল। বলো তো দেখি এতে কি সমুদ্রের পানিতে কোনো ঘাটতি হবে? ঠিক তদ্রূপ দানের ফলে আল্লাহর খাজানাতেও কোনো ঘাটতি হয় না। তাই তো নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দানশীলের যে তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন তার মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে সাব্যস্ত করেছেন।

এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন স্বয়ং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ইরশাদ করছেন,

ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِى آدَمَ

আদম সন্তানের মধ্যে আল্লাহর পরে যদি কেহ দানশীল থাকে তবে সেটা আমিই। সত্যিকার অর্থেই তাঁর বদান্যতা ছিল অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। বদান্যতা বা দানশীলতা কত প্রকার তা জানা আছে কি? বদান্যতা মোট তিন প্রকার। এক. আর্থিক দানশীলতা, যা আমরা সবাই বুঝি। দুই. আত্মিক দানশীলতা। তা হচ্ছে কোনো বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। তিন. ইলমী দানশীলতা। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে বদান্যতার এই তিন প্রকারই পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজের মাল দ্বারা বদান্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি এত বড় দাতা ছিলেন যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আয়াত অবতীর্ণ করে তাকে ফেরাতে হয়েছে। আপনারা নিশ্চই শুনেছেন, কোরআনের এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি কেন সব জিনিস অন্যকে দিয়ে দেন, নিজের শরীরের কাপড়টি পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছেন। নামাযের সময় একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন। দেহ মোবারকে একটি কাপড় ছিল। সেটাও এক যাচনাকারীকে দিয়ে দিলেন। এবার ভেবে দেখুন কী গায় দিয়ে বাইরে বেরোলেন তিনি? এর চেয়ে বড় দানশীলতা আর কী হতে পারে!

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (الاسراء ٢٩)

এই আয়াতটি যে ছাত্ররা তাফসীরের কিতাবে পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে এর প্রেক্ষাপট ও শানে নুযুলের ঘটনা।

আত্মিক দানশীলতার কথা কী আর বলব। সাহাবায়ে কেরামের সাথে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে আচার-ব্যবহার তার দৃষ্টান্ত পৃথিবী দেখাতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সকল কাজে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সশরীরে অংশ নিতেন। ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, ক্ষুধার তাড়নায় একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন। নবীজি (সা.)-এর কাছে এসে যখন তাঁরা কাপড় উঠিয়ে এই দৃশ্য দেখালেন তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বলেন, তোমরা তো একটি করে পাথর বেঁধেছ আর এই দেখো আমি দুটি পাথর বেঁধেছি। এটাই হচ্ছে আত্মিক সাখাওয়াত বা দানশীলতা। উম্মতের জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব কোরবানী করে দিয়েছিলেন। নিজের কোনো জিনিস নিজের বলে রেখে দেননি বরং উম্মতের মাঝে বিলীন করে দিয়েছেন। উম্মত এর কি প্রতিদান দিতে পারবে? আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না। এই জন্য বিদায় হজের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের সামনে

দণ্ডায়মান হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার সাহাবীগণ! আল্লাহ তা'আলা যে আমানত আমার কাছে দিয়েছিলেন আমি কি সঠিকভাবে তোমাদের কাছে তা পৌঁছাতে পেরেছি? هل بلغت এই প্রশ্ন তিনি সাহাবাদের সামনে উত্থাপন করেন, যাঁরা সরাসরি তাঁর জানি বদান্যতা, মালি বদান্যতা, ইলমী বদান্যতা আজীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন প্রশ্ন করার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম চিৎকার করে বলে উঠলেন,

نشهد انك قدبلغت واديت ونصحت

(مسلم ١/٣٩٤ رقم ١٢١٨)

আল্লাহর কসম আপনি ওই আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতের সাথে যথাসাধ্য পূর্ণ খায়েরখাহী ও হিতাকাঙ্ক্ষীমূলক আচরণ করেছেন। দ্বীনের জন্য আপনি যে কোরবানী পেশ করেছেন আমরা তার কল্পনাও করতে পারি না। সাহাবাদের মুখে তিনি এ কথা শুনে সাথে সাথে আসমানের দিকে আঙুল উঠিয়ে বললেন اللهم اشهد হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, যে আমানত আপনি আমার হাতে দিয়েছিলেন তা আমি এদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

ভাই ও দোস্ত! নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মিক কোরবানীর ফিরিস্তি এত দীর্ঘ, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তিনি ছিলেন বনী আদমের মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল। তিনি বলেন انا اجود بنى ادم আমি মানব জাতির মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর সবচেয়ে বড় দানশীল কে? দেখুন, প্রথমত সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা, আল্লাহর পরের স্থানে রয়েছেন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর আল্লাহর নবীর পর এই উম্মতের সবচেয়ে বড় দানশীল কে? নবীজি ফরমান,

وَأَجْوَدُهُمْ مَنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ

আমার পরে উম্মতের সবচেয়ে বড় দানশীল, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাল দিয়ে মানুষকে সাহায্য করে সেও দানশীল কিন্তু সবচেয়ে বড় দাতা নয়, যে জান দিয়ে সাহায্য করে সেও দানশীল কিন্তু সবচেয়ে বড় বদান্য নয়, সবচেয়ে বড় দানশীলতা আর বদান্যতা হচ্ছে তৃতীয় নম্বরের দান। পূর্বে বলা হয়েছিল দানশীলতার তিনটি প্রকার রয়েছে, মালি, জানি ও ইলমী দানশীলতা। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার পর উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল ওই ব্যক্তি, যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে علم علما আর ইলমে দ্বীন হাসিল করে কোনো কারখানায় চাকরি করেনি, অফিস-আদালতে গিয়ে বসেনি, বরং ইলম হাসিল করার পর ثم نشر তার প্রচার-প্রসারে লেগে গেছে। ওই সমস্ত লোকের কাছে ইলম পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছে, যাদের সিনা ইলমে দ্বীন থেকে খালি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এই ব্যক্তিই আমার উম্মতের মাঝে সবচেয়ে বড় দানবীর। এখন বলুন, আপনারা দানশীল হতে পারবেন কি না? আপনাদের পকেট খালি হতে পারে কিন্তু সিনা খালি নয়। আপনারা নিজেদের পকেটের দিকে দেখবেন না, সিনার দিকে দেখবেন। আপনাদের সিনায় ইলম রয়েছে। আপনাদের বক্ষে কোরআনের ইলম আছে, হাদীসের ইলম আছে, শরীয়তের ইলম আছে, ইসলামের ইলম আছে। কাজেই আপনারা সবচেয়ে বড় দানশীল হতে পারবেন فنشر এর ওপর আমল করে ইলমের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এ পর্যায়ে ইলম হাসিল করার সুযোগ দান করেছেন, এরপর আসবে তা পৌঁছানোর পালা। বর্তমান সময়টি হচ্ছে ইলম হাসিলের সুবর্ণ সুযোগ, ইলম হাসিল করতে হলে আপনাদের কয়েকটি বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। সতর্কতার সাথে মাদরাসায় চার দেয়ালের ভেতর সময় কাটাতে হবে। যদি আপনারা এ সকল বিষয়ে সজাগ থাকতে পারেন তবে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনাদেরকে ইলমের সম্পদ দিয়ে ধন্য করবেন। আপনাদের উম্মতের সবচেয়ে বড় দানশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আসুন জেনে নিই ওই সকল বিষয়। আপনাদের শুধু তিনটি কাজ করতে হবে। যে এই তিনটি কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সামনে ইলমের রাস্তাসমূহ খুলে দেবেন। তাকে ইলমে নাফে'র দৌলত দেবেন এবং তাকে উম্মতের দানবীরদের তালিকায় স্থান দেবেন।

তিন কাজের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, এ কথার প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, যা কিছু ক্লাসে আসাতিযায়ে কেরাম থেকে শুনব তা মুখস্থ রাখার প্রতি যত্নবান হব। যদি তালিবে ইলম নিজের সবক ও পাঠ মুখস্থ করার চেষ্টা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলমে নাফে দান করবেন। আর যদি শুধুমাত্র সবকে হাজির হয়ে বসে থাকে। যেমন–কেউ বলেছিল দরসগাহে ছাত্রদের واحد এর অবস্থা جمع غائب এবং حاضر হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র শরীর হাজির থাকে আর যেহেন, দেমাগ, চিন্তা-ফিকির সব অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়। সবক শেষ হয়ে

যায় অথচ সে বলতে পারে না শুরু কোথা থেকে হয়েছে আর শেষ কোথায় হয়েছে। তাহলে বলুন ইলমে নাফে কী করে তার অর্জন হবে। ইলমে নাফে দ্বারা তার সিনা কিভাবে পূর্ণ হবে। তাই সবকে বসেন এবং প্রস্তুতি ও মনোযোগ সহকারে বসেন। বুজুর্গরা বলেছেন, দরসে বসার সময় ওজুসহ বসা হলে ইলমে নববীর নূরে সিনা আলোকিত করা সহজ হয়।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আপনারা হয়তো মুফতী আজম মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের নাম শুনেছেন, তিনি প্রায় ৫-৬ বছর জামেয়া কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদে লেখাপড়া করেছেন এরপর দেওবন্দ গিয়ে সেখান থেকে ফারেগ হয়েছেন। ভারত বিভক্তির আগেই তিনি মুফতী আজম হিন্দ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তার মানে হলো তিনি হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ গোটা ভারতবর্ষের মুফতী আজম ছিলেন। ওই সময় তাঁকে মুফতী আজমে হিন্দ বলা হতো। একবার তাঁর সহপাঠীদের কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, মুফতী সাহেব আপনি তো কিতাবের পোক বনে খুব বেশি পড়াশোনা করেননি, বরং শুধু সবকের গুরুত্ব দিতেন। সবকে তো আমরাও বসেছি আপনিও বসেছেন, কিন্তু যে মর্যাদা আল্লাহ পাক আপনাকে দান করেছেন সেটা তো অন্য কেহ পায়নি, এর রহস্যটা কী? মুফতী সাহেব যে উত্তর দিলেন তা ছাত্র ভাইদের জন্য মূল্যবান পাথেয় হতে পারে। তিনি বললেন, আমি কিতাবের স্তূপ নিয়ে বসে থাকতাম না, যেমন আজকাল ছাত্ররা করে থাকে। সারা বছর পড়ে না পরীক্ষা আসলে রাত জেগে কিতাবে মশগুল হয়ে যায়। বরং আমার অভ্যাস ছিল ভিন্ন। আমি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সবকে যেতাম। উস্তাদ ক্লাসে যে সবক পড়াতেন ধ্যান দিয়ে শুনতাম, আর সবক শেষে ছাত্ররা যখন দরসগাহ থেকে চলে যেত আমি তখন যেতাম না। আমি বসে বসে ওই সব পাঠ এক-দুবার পড়ে নিতাম। ব্যস, এতে ওই পাঠ আমার অন্তরে পাথরে অঙ্কন করার ন্যায় অঙ্কিত হয়ে যেত।

আপনারাও যদি এভাবে পড়তে পারেন তবে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ইলমে নাফে দান করবেন। আর যদি বেপরোয়াভাবে পড়াশোনা করেন, নিজেকে মুখাপেক্ষী বানিয়ে না পড়েন তবে মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার এমন লোকের কোনো দরকার নেই।

আমি গতকাল এক জায়গায় বয়ান করতে গিয়ে একটি আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছিলাম–দেখুন, আল্লাহ বড়ই বে-নিয়াজ-অমুখাপেক্ষী। আমরা যদি তার সামনে মুখাপেক্ষী হয়ে হাজির না হই তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মর্তবা বৃদ্ধি করবেন না।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (محمد ٣٨)

আল্লাহ অন্য কোনো জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের ইলমে নাফে দান করে ইলমের প্রচারে লাগাবেন। অতএব সবার দু'আ করা উচিত, হে আল্লাহ! অন্য কোনো জাতিকে আনার প্রয়োজন নেই ইলমের ধারক-বাহক হতে। আমরাই প্রস্তুত আছি। এটা হলো প্রথম বিষয়। আমি বলেছিলাম, আপনারা তিনটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ইলমে নাফে দান করবেন। প্রথম কথা হচ্ছে, সবকে পাবন্দির সাথে উপস্থিত হোন এবং উস্তাদ যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন। আমাদের ছাত্ররা সবকে উদাসীন থাকে, মনে করে শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ দেখে পরে বুঝে নেব, ইয়াদ করে নেব। কিন্তু মনে রাখবেন, এই ইলম শরাহ-শুরূহাত দেখে অর্জন করা সম্ভব হবে না। ইলম সিনা থেকে সিনায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এই ইলমের একটি পরম্পরা ধারা রয়েছে, এর ইতিহাস রয়েছে। এটাকে শুধু কিতাব থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখে তা হাসিল করা যায় না, এটা তো সিনা থেকে সিনা হতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। যদি ক্লাসে বসে উস্তাদের মুখনিসৃত কথাগুলো ধ্যানের সাথে শ্রবণ করা হয় তবে ইলমের মাঝে কখনো দুর্বলতা দেখা দেবে না।

দ্বিতীয় কাজ : ইলমে নাফে অর্জনের জন্য দ্বিতীয় যে কাজ করতে হবে তা হচ্ছে এ কথার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে আমরা কোনো কাজ, কোনো কথা বা আচার-আচরণ দ্বারা কখনো কোনো উস্তাদের মনে ব্যথা দেব না। যে নিজের উস্তাদের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার ইলম ও আমলে বরকত দান করবেন। আর যার কথা বা কাজ অথবা আচার-ব্যবহার দ্বারা কোনো উস্তাদের অন্তরে কষ্ট লাগে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সে যত বড়ই যোগ্যই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে ফয়জ ও বরকতের দরজা বন্ধ করে দেন। ফয়জ জারি যদি হতে হয়, তবে তা আসাতিযায়ে কেরামের দু'আর বরকতেই জারি হবে। আপনাদের অর্জিত ইলম যদি ইলমে নাফেয়ে রূপান্তরিত হতে হয়, তবে তা একমাত্র আসাতেযায়ে কেরামদের দু'আর বরকতেই সম্ভব হতে পারে।

আমি একটি ঘটনা বলে সামনে অগ্রসর হব। আসাতেযায়ে কেরামের দু'আর বরকত একজন ছাত্রকে সূর্যপুরুষ

বানাতে পারে। আপনারা হয়তো শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর নাম শুনেছেন। উস্তাদের দু'আর বরকতেই তিনি শায়খুল ইসলাম হতে পেরেছেন। শায়খুল আরব ওয়াল আযম হতে পেরেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.) যখন মাল্টার জেলে ছিলেন তখন শায়খুল ইসলাম (রহ.)ও জেলে ছিলেন। কেন ছিলেন? শুধুমাত্র উস্তাদের খেদমতের জন্য ছিলেন।

তৎকালীন সৌদি সরকার শায়খুল হিন্দ (রহ.)-কে গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করে। শায়খুল ইসলাম (রহ.) তখন মদীনা শরীফে থাকতেন। তিনি সৌদি সরকারের কাছে নিজেকে পেশ করে বললেন, যদি আমার উস্তাদকে গ্রেফতার করতে হয় তবে আমাকেও গ্রেফতার করে নেন। সবাই তাকে বোঝাতে লাগল, আপনার তো কোনো অপরাধ নেই। উনি তো হিন্দুস্তানে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, আর আপনি তো এখানে থাকেন। আপনার কোনো অপরাধ নেই। আপনি কেন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করবেন। এর উত্তরে তিনি বললেন, আমার উস্তাদ এই বৃদ্ধ বয়সে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পড়ে থাকবেন আর আমি বাড়িতে বসে আরাম করব–এটা হতে পারে না। আমার উস্তাদের দুঃখ-বেদনায় আমি নিজের জান কোরবান করতে প্রস্তুত। অতএব নিজেই এক স্থানে লিখেন, মাল্টায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ত। শীত থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গরম পানি পাওয়া যেত না। আমার উস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহ.) রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এত ঠাণ্ডার মধ্যে হযরতকে কী করে গরম পানির ব্যবস্থা করে দিতে পারি, কোনো উপায় ছিল না। অবশেষে আমি লোটায় পানি ভরে পেটের ওপর রেখে ওপরে লেপ দিয়ে ঢেকে শুয়ে পড়তাম।

বন্ধুগণ! চিন্তা করে দেখুন, কনকনে শীতের রাতে ঠাণ্ডা পানির লোটা পেটে লাগিয়ে যদি কেহ ঘুমায় তার কি ঘুম আসবে? এভাবে সারা রাত পানি পেটের ওপর রেখে শুয়ে থাকতেন। শেষ রাতে যখন উস্তাদে মুহতারাম উঠতেন তখন ওই পানি ওজুর জন্য পেশ করতেন। পানি গরম তো হতো না তবে এর ঠাণ্ডাভাব কিছুটা কমে আসত। এভাবে খেদমত করেছেন। উস্তাদের দিল থেকে তাহলে কেমন দু'আ বের হয়েছে চিন্তা করে দেখুন। আজকাল তো ছাত্ররা উস্তাদকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আর যে সবচেয়ে মেধাবী ও পড়ালেখায় ভালো হয় সে তো আরো বেশি ধোঁকা দেয়। রাতে কিতাব মুতালা'আ করে এশকাল ও তার জবাব লিখে নিয়ে আসে। দরসগাহে এসে উস্তাদের সামনে বসে যায়। উস্তাদ যখন সবক পড়াতে গিয়ে ওই স্থানে পৌঁছে তখন সে এশকাল করা আরম্ভ করে। অথচ তার হাতে ওই এশকালের জবাব লেখা আছে। এভাবে উস্তাদকে পেরেশান করা কল্যাণকর নয়। মনের চোরকে আল্লাহ তা'আলা দেখছেন কি না? হ্যাঁ, যদি কোনো কথা বুঝে না আসে তবে জিজ্ঞেস করার অধিকার আছে। কিন্তু উস্তাদের পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার আপনার নেই।

বন্ধুগণ! এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কাজ। অর্থাৎ ইলমে নাফে অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে নিজের কোনো কাজ বা ব্যবহার দ্বারা যেন উস্তাদের মনে কষ্ট না আসে।

শেষ কথা : যদি আপনারা ইলমে নাফে অর্জন করতে চান তবে সিদ্ধান্ত নিন যে আমরা এখন, এই ছাত্র জীবনে এবং ফারেগ হওয়ার পর আগামী জীবনে সদা-সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করে সে যদি গোনাহ এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয় তাহলে বলুন ইলমের নূর তার সিনায় কিভাবে পয়দা হবে? আজকাল ছাত্ররা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। আমরা যখন দেওবন্দে পড়তাম মাওলানা এনামুল হক সাহেবও আমাদের সাথী ছিলেন, আমাদের সাথীদের মধ্যে অনেকে একটি প্রবাদ শোনাত,

يجوز للطلاب ما لا يجوز لغيره

'অর্থাৎ অন্যদের জন্য যেটা জায়েয নেই, সেটাও ছাত্রদের জন্য জায়েয।'

আশ্চর্য কথা! এটা তারা কোথায় পেল। যেকোনো কথা নাজিল হওয়ার দুটি ধারা আছে। একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আরেকটি শয়তানের পক্ষ থেকে। এটা নিশ্চয়ই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে এসেছে। অথচ বাস্তব সত্য হলো,

حسنات الابرار سيئات المقربين

আপনারা তো مقربين তথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ইলমে দ্বীন নসীব করার জন্য দুনিয়ার পচা-গান্ধা পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে মাদরাসার পরিবেশে নিয়ে এসেছেন। আপনারা তো আল্লাহর খাছ বান্দা। আপনাদের জন্য তো حسنات থেকে বেঁচে থাকাও জরুরি। অনেক জায়েয কাজও ছেড়ে দিতে হবে এবং তাকওয়ার ওপর আমল করতে হবে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজকাল গোনাহের সয়লাব চলছে। গোনাহের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে। আমি যত মাদরাসায় গিয়েছি সবখানে এ কথাটি বলেছি যে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল বর্তমানে সকল গোনাহের উৎস। অথচ আমাদের

প্রত্যেক তালিবে ইলমের হাতে এই মোবাইল ফোনসেট রয়েছে। মনে রেখো যে যুবকের হাতে মোবাইল রয়েছে তার চোখও গোনাহ করে, তার কানও গোনাহ করে, অন্তর ও চিন্তা-চেতনাও গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে। তাহলে বলুন, এমন ব্যক্তির সিনায় ইলমের নূর কিভাবে সৃষ্টি হবে?

হযরত ওকী (রহ.)-এর কাছে যখন ইমাম শাফী (রহ.) তাঁর স্বরণশক্তি কমে যাওয়ার অভিযোগ করল তখন তিনি কী বলেছিলেন?

شكوت الى وكيع سوء حفظى
فاوصانى الى ترك المعاصى

ইমাম শাফী (রহ.) তাঁর উস্তাদ ওকী (রহ.)-এর কাছে স্বরণশক্তি কমজোর হয়ে পড়ার কথা বললেন। তিনি ভিটামিন, বাদাম, কিশমিশ বা অন্য কোনো ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেননি বরং তিনি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিলেন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আপনারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। যে ইলম শিখতে এসেছেন তাতে সফলতা তখনই আসবে, যখন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন। আমি ছাত্রদের বলি যে দ্বীনের হুকুম-আহকাম পালনে ত্রুটি হয়ে গেলে তা মাফের আশা করা যায়, কিন্তু اجتناب نواهى তথা গোনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ত্রুটি হলে মাফের প্রশ্নই আসে না। কেননা ইলমের নূর গোনাহের অন্ধকারের সাথে একত্র হতেই পারে না ونورالله لايعطى لعاصى অনেক তালিবে ইলম বলে থাকে আমাদের কাছে মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোন নেই, সাধারণ মোবাইল ফোন আছে আমরা তার অপব্যবহার করি না। আমি বলব, এমন ছাত্ররা নিজেকেও ধোঁকা দিচ্ছে, অন্যকেও ধোঁকা দিচ্ছে। কেননা গোনাহ থেকে বাঁচার কী গ্যারান্টি আছে? আজকে হয়তো আপনি গোনাহ থেকে বাঁচতে পারছেন, কাল পারবেন কি না তা বলা যায় না। যুবক বয়স আবার শয়তান ও নফস সদা পেছনে লেগে আছে। কখন যে আপনাকে গোনাহে লিপ্ত করিয়ে দেবে বুঝতেও পারবেন না। কাজেই এই ঝুঁকিতে পড়ার কী দরকার? মোবাইল ফোনটা দূরে সরিয়ে দিলেই তো হয়। তাহলে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আপনাকে গোনাহ থেকে হেফাজত করবেন। কভু নিজের ওপর ভরসা করতে নেই। চাই ছাত্র হোক বা আলেম, সদা-সর্বদা নিজের ফিকির নিজের নেগরানি করতে হবে। وما ابرأ نفسى ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربى মানুষ নিজের ফিকির করলে তবেই আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকবে। সে নফসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। অতএব গোনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। অনেক মেহনত করে আপনারা পড়ালেখা করছেন, করতে থাকুন এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হোন।

এক. সবকের প্রতি পাবন্দি এবং মনোযোগ দিয়ে উস্তাদের কথা শোনা ও তা মনে রাখার চেষ্টা করা।

দুই. নিজের কোনো কথা, কাজ বা আচার-ব্যবহার দ্বারা কোনো উস্তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

তিন. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

এর সাথে আরো একটি কাজ করতে হবে। তাহলে মোট চারটি কাজ হবে, শেষ কাজটি হলো আমল। ইলমে নাফে পেতে হলে যা কিছু আপনারা পড়বেন তার ওপর আমল শুরু করে দেবেন। যদি ইলম অনুযায়ী আমল শুরু করে দেন তবে আল্লাহ তা'আলা ওই ইলমকে ইলমে নাফে বানিয়ে দেবেন। আর যদি ইলম অনুযায়ী আমল না হয় তবে মনে রাখবেন এই ইলম কোনো কাজে আসবে না। আমাদের এক উস্তাদ বলতেন, ইলমে দ্বীন তো শুধু ইলমের জন্য নয় বরং আমলের জন্য। তাই আমলের থলে যদি খালি হয় তবে শুধু ইলম দ্বারা কোনো লাভ হবে না। আজ আমলের মাঝে অতিমাত্রায় কমতি পরিলক্ষিত হয়।

আপনাদের বলব, মাদরাসার চার দেয়ালে থাকাবস্থায় যদি আমলের ঘাটতি থাকে তবে আপনি শায়খুল হাদীস হয়ে যাওয়ার পরও আমলের মাঝে ঘাটতি রয়ে যাবে। কেননা অভ্যাস গড়ার স্থান হচ্ছে পরিবেশ। যদি এই পরিবেশে আমলের অভ্যাস না হয় তবে আর কোথায় গেলে হবে? স্মরণ রাখবেন! কোরআনে কারীমের কোনো আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলমের বিপরীত জান্নাতের ওয়াদা করেননি, জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আমলের বিনিময়ে। হ্যাঁ, ইলম হচ্ছে আমলের মাধ্যম, ইলম মাকসুদে হাকীকি নয়।

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (نحل ٩٧)

এখানে বলা হয়েছে,

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُون

এটা বলা হয়নি ماكانو يعلمون অর্থাৎ প্রতিদান মিলবে আমলের বিনিময়ে, ইলমের বিনিময়ে নয়। ইলমের ফজীলত সেটা ভিন্ন কথা।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে যা কিছু জানলাম, শিখলাম ও বুঝলাম সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়ত কী বলে

মুফতী নূর মুহাম্মদ

আজ পৃথিবীতে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন কৌশলে মুসলমানদের ঈমান, আকীদা, কৃষ্টি-কাল্চার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের একটি বড় ষড়যন্ত্র মুসলিম নারীদের ঘর থেকে বের করে ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে সমূলে বিনাশ করা। তাদের রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজবিরোধী বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের সুনাম ক্ষুণ্ন করা। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের এই যুগে বন্ধুবেশী বিশেষ একটি মহল সরলমনা মুসলিম নারীদের দ্বীনের দোহাই দিয়ে ঘর থেকে বের করার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। তা হচ্ছে, সাওয়াবের লোভ এবং বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে নারীদের নামাযের জন্য মসজিদে এবং ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া। প্রতারিত হয়ে নারীরাও অধিক সাওয়াবের আশায় গৃহকোণ ত্যাগ করে মসজিদ ও ঈদগাহে ছুটে চলছে। অথচ নারীদের ওপর ঈদ ও জুমু'আর নামায কোনোটাই ওয়াজিব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যও মহিলাদের মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়াতেই বেশি সাওয়াব বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। তাদের জামাতে নামায আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া শরীয়ত অনুমোদিত নয়। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য কোরআন-হাদীসের আলোকে সামান্য আলোকপাত করা হলো।

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসংখ্য হাদীসে মহিলাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করার প্রতি অত্যাধিক তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত ও হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে বুঝে আসে, যতদূর সম্ভব নারীদের স্বীয় গৃহে অবস্থান করা এবং একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়া জরুরি। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" (সূরা আহজাব, আয়াত ৩৩, ৩৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان

"নারীগণ আপাদমস্তক ঢেকে রাখার বস্তু। যখনই সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তার প্রতি উঁকি ও কুদৃষ্টি দিতে থাকে।" (জামে তিরমিযী, হা. ১১৭৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها

"নিঃসন্দেহে তখনই সে আল্লাহর পছন্দনীয় থাকে, যখন স্বীয় বাড়ির সবচেয়ে গোপন স্থানে অবস্থান করে।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হা. ১৬৮৬)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه

"নারীদের সৌন্দর্যের দিকে তাকানো ইবলিস শয়তানের বিষাক্ত তীরসমূহ থেকে একটি তীর।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হা. ৭৮৭৫, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১০১)

হাকেম (রহ.) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

সবার জানা আছে যেকোনো তীর ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র, আর বিষাক্ত তীর আরো ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী। মানুষের ঈমান-আমল নষ্ট করার এবং তাদের পথভ্রষ্ট করার অসংখ্য হাতিয়ার শয়তানের রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর নারী। এ ব্যাপারে শয়তানের বক্তব্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তাশক্তিকে আরো গতিশীল করবে। বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে,

لما خلقت المرأة قال ابليس انت نصف جندي وانت موضع سري وانت

سهمى الذى ارمى به فلا اخطئ

যখন আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেন, তখন ইবলিস বলল, তুমি (হে নারী) একাই আমার বাহিনীর অর্ধেকের সমতুল্য। তুমি আমার রহস্য ভেদের স্থান। তুমি আমার সেই তীর, যা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। (মাকাইদুশ শয়তান, ইবনে আবিদ্দুনিয়া, পৃ : ৫৯)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে বোঝা গেল, নারীদের ঘরে অবস্থান করার মধ্যেই তাদের নিজেদের এবং অন্য সকলের মঙ্গল নিহিত।

নারীদের নামায

একজন ব্যক্তি নারী হোক, পুরুষ হোক ঈমান আনয়ন করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে ইবাদতটি করতে হবে তা হলো নামায। নামায আদায় জামাতের সাথেও করা যায়, একাকীও করা যায়। নামায আদায়ের স্থান মসজিদও হতে পারে, আবার ঘর বা অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। এসব বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে বিধানগত দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দুজনের বিধান এক ও অভিন্ন মনে করার অবকাশ নেই। কোরআন-হাদীস ও শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শীরাই এসব বিষয়ে নারী-পুরুষকে এক কাতারে দাঁড় করানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে নারীদের একাকী ঘরে নামায আদায়ের নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন, সেখানে কিছু অপরিণামদর্শী লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেওয়া ছাড়কে উপেক্ষা করে কথিত দ্বীন ও সাওয়াবের নামে তাদের ঘর থেকে বের করে পুরুষের কাতারে দাঁড় করানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের পক্ষে শরীয়তের মেজাজ বোঝা কঠিন ও অসম্ভব হওয়ারই কথা। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা সকলকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুক। এখানে নারীদের নামায প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

জামাতের বিধান নারীদের জন্য নয় :

ফরয নামায জামাতের সহিত আদায় করা পুরষদের জন্য ওয়াজিবের পর্যায়ের। অসংখ্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। কিন্তু মসজিদের জামাতে নারীদের অংশগ্রহণ ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল–কোনোটাই নয়। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

১. যেসব পুরুষ জরুরতবিহীন মসজিদে না এসে ঘরে নামায পড়ে তাদের বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে রাসূল (সা.) ধমকিস্বরূপ বলেন,

لولا ما فى البيوت من النساء والذرية، لأقمت الصلاة، صلاة العشاء ، وأمرت فتياني يحرقون ما فى البيوت بالنار

"যদি ঘরগুলোতে নারী ও শিশুসন্তান না থাকত তাহলে আমি এশার নামাযের ইমামতির দায়িত্ব অন্যজনকে দিয়ে কিছু যুবক দলকে দিয়ে ঘরের সব কিছু জ্বালিয়ে দিতাম।" (মুসনাদে আহমাদ, হা. ৮৭৯৬, মুসনাদে আবী দাউদ ত্বায়ালিসি, হা. ২৪৪৩)

উক্ত হাদীসে নারী ও শিশু না থাকলে ঘর জ্বালানোর কথা এ জন্যই বলা হয়েছে যেহেতু মহিলা ও শিশুর ওপর মসজিদের জামাত নেই, তাই এখানে বালেগ পুরুষদেরই উক্ত ধমকি দেওয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মসজিদের জামাতের বিধান নারীদের জন্য নয়।

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

والذى نفسى بيده، لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذى نفسى بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

"ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! আমার ইচ্ছা হয় কাউকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি। আর কাউকে আযান দেওয়ার হুকুম করি। অতঃপর একজনকে ইমামতি করার আদেশ করে স্বয়ং নিজে গিয়ে সেসব পুরুষের ঘর জ্বালিয়ে দিই, যারা জামাতে অংশগ্রহণ করেনি।" (বোখারী হা. ৭২২৪)

এই হাদীসে শুধুমাত্র পুরুষদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ধমকি দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল নারীদের জামাতে অংশগ্রহণ করার বিধান শরীয়তে নেই।

৩. ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আরেক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لا خير فى جماعة النساء ، ولا عند ميت فإنهن إذا اجتمعن قلن، وقلن

নারীদের জামাতে কোনো কল্যাণ নেই।.....কারণ তারা কোনো স্থানে সমবেত হলে স্বভাবসুলভ আলাপচারিতায় মত্ত হয়। (আল মু'জামুল কাবীর, হা. ১৩২২৮)

মুসলমান মাত্রই এ কথা জানে যে মসজিদ ইবাদতের জায়গা। আলাপচারিতার স্থান নয়। আর এটাও বাস্তব সত্য যে, নারীদের স্বভাবসুলভ ব্যাপার হলো, তারা কোনো স্থানে একত্রিত হলে পরস্পরে বিভিন্ন আলাপচারিতায় মগ্ন হয়, যা মসজিদের পবিত্রতার পরিপন্থী–কোনো সন্দেহ নেই। এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সমবেত হওয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই মর্মে ঘোষণা করেছেন। এর পরও কি দ্বীন ও সাওয়াবের দোহাই দিয়ে নারীদের

জামাতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, কল্যাণকর বলার অবকাশ আছে? নাকি সরলমনা মুসলিম নারীদের নামাযের নামে মসজিদে একত্রিত করে তাদের দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে ধূলিস্যাৎ করে দেওয়াই কোনো কুচক্রী মহলের অভীষ্ট লক্ষ্য। দৈনিক খবরের কাগজে নজর বোলালেও এর সত্যতার প্রমাণ মেলে।

জুমু'আর নামাযে নারীদের অংশগ্রহণ :

নারীদের জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আলাদা সুব্যবস্থা রাখার জন্য অনেকে নিজেদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে। তারা মনে করে, এটা অনেক বড় সাওয়াব ও পুণ্যের কাজ। কথিত এই দ্বীনি কাজের জন্য তাদের মাতম চোখে পড়ার মতো। কারো মাতমে প্রভাবিত না হয়ে আমাদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে ইসলামী শরীয়ত নারীদের ওপর জুমু'আর নামায পড়ার বিধান রেখেছে কি না? হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার অনুসন্ধান করে দেখা যায়, নারীদের ওপর জুমু'আ ওয়াজিব নয়। তাদের কোনো জুমু'আ নেই। এখানে কিছু হাদীস প্রদত্ত হলো।

১. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ": الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة :عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض "

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "জামাতে জুমু'আর নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অকাট্য ওয়াজিব, তবে ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়। (সুনানে আবী দাউদ, হা. ১০৬৭, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা. ১০৬২)

ইমাম হাকেম (রহ.) বলেন, হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফেয যাহাবি (রহ.)ও হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (আল মুস্তাদরাক-টীকাসহ-১/২৮৮)

২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী (রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه إلا عبدا أو امرأة أو صبى أو مريض

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে তার ওপর জুমু'আ ফরয, তবে ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়।" (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হা. ৫২০০)

হাদীসটির বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ নেই। (দেখুন, মা'রিফাতুস সুনানী ওয়াল আসার, হা. ৬৩৬৩)

সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপ :

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোনো নারী জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে চলে এলে তাঁরা তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন? কী পদক্ষেপ নিতেন? নিম্নের বর্ণনাসমূহ দ্বারা বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

১. হযরত আবু আমর শায়বানী (রহ.) থেকে বর্ণিত,

عن أبى عمرو الشيبانى، أنه :رأى ابن مسعود، يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول :اخرجن إلى بيوتكن خير لكن

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জুমু'আর দিন নারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন এবং বলতেন, আপনারা মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘরে চলে যান। কারণ আপনাদের ঘরই আপনাদের জন্য নামাযের উত্তম স্থান। (আল মু'জামুল কাবীর, হা. ৯৪৭৫)

আল্লামা হাইসামী (রহ.) বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩৫)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

كان ابن عمر يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) জুমু'আর নামায পড়ার জন্য কোনো নারী মসজিদে এলে তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন এবং তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। (উমদাতুল কারী ৬/১৫৭)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

رأيت ابن مسعود يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة

তিনি জুমু'আর দিন নারীদের পাথর মেরে মেরে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৭৬১৭)

উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে বোঝা গেল, সাহাবায়ে কেরাম নারীদের জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য মসজিদে ব্যবস্থা রাখা তো দূরের কথা, কেউ চলে এলে তাকে বারণ করতেন এবং বের করে দেওয়ার মতো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

উল্লেখ্য, তাঁদের এই পদক্ষেপ নারী জাতিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং আল্লাহর আজাব থেকে তাদের এবং মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানোর জন্য ছিল। এই হলো ইসলামের সোনালি যুগের ঘটনা। যে যুগের লোকদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম হওয়ার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের মোবারক যবানে দিয়েছেন। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পর আজও সাহাবাদের আমল থেকে বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।

নারীদের নামাযের সর্বোত্তম স্থান :

মুসলমান মাত্রই তার ভেতর এই আবেগময় প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে পুরুষরা তো মসজিদে জামাতের সহিত নামায আদায় করে অসংখ্য নেকী অর্জনে সক্ষম। দ্বীনদার মুসলিম নারীরা

মসজিদে যেতে না পারলে এই নেকী কিভাবে অর্জন করবে? এই আবেগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সব কাজ আবেগের বশীভূত হয়ে করা যায় না। বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে নামাযের মতো একটি ইবাদত আবেগ দিয়ে নয় বরং দলিল ও প্রমাণের আলোকে সম্পাদন করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের নারী সদস্যদের এই আবেগের যথার্থ মূল্যায়ন করে মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব অর্জনের পথ ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন,

নারীগণের ঘরের নির্জন কক্ষের নামায মসজিদের নামাযের তুলনায় বেশি ফজীলতপূর্ণ। এ মর্মে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها، وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারীদের ক্ষুদ্র কক্ষের নামায বড় কামরার নামাযের তুলনায় উত্তম। ঘরের নির্জন কোণের নামায ক্ষুদ্র কক্ষের নামাযের তুলনায় উত্তম।" (আবু দাউদ, হা. ৫৭০)

অপর বর্ণনায় হাদীসটি হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) থেকে আরো বর্ধিতভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وصلاتها فى دارها خير من صلاتها خارج

"এবং নারীদের বাড়িতে নামায পড়া বাড়ির বাইরে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (আল মু'জামুল আওসাত, হা. ৯১০১)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীসটির সূত্র ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। (খুলাসাতুল আহকাম ২/৬৭৮) ইমাম হাকেম (রহ.) বলেন, হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রহ.)-এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফেয যাহাবী (রহ.)-ও তাঁর সমর্থন করেছেন। (আল মুস্তাদরাক-টীকাসহ-১/২০৯)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে আরো বর্ণিত আছে,

ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان فى بيتها ظلمة

"নারীদের কোনো নামায আল্লাহর নিকট তার ওই নামায অপেক্ষা পছন্দনীয় নয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকার কক্ষে আদায় করে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২১১৫)

নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরের নির্জন কক্ষকে নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ আখ্যায়িত করেছেন এবং সেখানে আদায়কৃত নামাযের সাওয়াব শুধু সাধারণ মসজিদই নয় বরং মসজিদে নববীতে আদায়কৃত নামাযের সাওয়াবের চেয়েও বেশি বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত,

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال": خير مساجد النساء قعر بيوتهن"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নারীদের সর্বোত্তম মসজিদ তাদের ঘরের নির্জন কক্ষ। (মুসনাদে আহমাদ, হা. ২৬৫৪২)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা বুসিরী (রহ.) বলেন, হাদীসটির সূত্র সহীহ। (ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা ২/৬৪)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সুয়াইদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত,

عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى، أنها جاء ت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنى أحب الصلاة معك، قال ": قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدى "، قال :فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل

একদা উম্মে হুমাইদ (নামক একজন মহিলা সাহাবী), যিনি আবু হুমাইদ সা-ইদি (রা.)-এর স্ত্রী, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে নামায আদায় করতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে পছন্দ করো। কিন্তু তোমার জন্য গৃহের অন্দরমহলে নামায পড়া উত্তম; বড় কামরার তুলনায়। বড় কামরায় নামায পড়া উত্তম বারান্দার চেয়ে। বারান্দা উত্তম তোমার পাড়ার মসজিদের চেয়ে। নিজ পাড়ার মসজিদ উত্তম আমার মসজিদ থেকে।" এ কথা শোনার পর উম্মে হুমাইদ (রা.) তাঁর গৃহের নির্জন স্থানে একটি নামাযের স্থান বানানোর নির্দেশ দিলেন এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত নামায আদায় করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা. ২৭০৯০, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হা. ১৬৮৯)

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান। (ফাতহুল বারী ২/২৯০)

এই হাদীসে মুসলিম নারীদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।

মসজিদে নববীতে নামাযের ফজীলত :

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী, "মসজিদে নববীর এক নামাযে অন্য মসজিদের এক হাজার নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়।" (বোখারী, হা. ১১৯০)

অপর হাদীসে রয়েছে, "একাকী নামাযের তুলনায় জুমু'আর মসজিদের নামাযে পাঁচ শত গুণ সাওয়াব বেশি।" এতে প্রমাণিত হলো, একাকী নামাযের তুলনায় মসজিদে নববীর নামাযে পাঁচ লক্ষ গুণ সাওয়াব বেশি।

তাহলে এবার চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, নারীদের "ঘরের নির্জন কক্ষে" আদায়কৃত নামাযের সাওয়াব মসজিদে নববীতে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে পাঁচ লক্ষ গুণ বেশি উত্তম !!!

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বিরোধিতা :

পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল কিছু লোক সরলমনা মুসলিম নারীদের মসজিদে গিয়ে জামাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে সুন্নাত মনে করে। সুন্নাত জিন্দা করার নাম দিয়ে তারা এই মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য পুরোদস্তর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধেই নয় বরং স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধেও। যদি মসজিদে এসে নারীদের নামায আদায় ওয়াজিব সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল কোনো একটি বিধানের আওতায় পড়ত তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের ঘরের নির্জন কক্ষে আদায়কৃত নামাযকে মসজিদে নববীতে আদায়কৃত নামাযের তুলনায় বেশি ফজীলতপূর্ণ কেন বললেন? তবে কি তাদের ভাষায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম নারীদের সুন্নাত পরিপন্থী কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন? নাউযুবিল্লাহ।

মনে রাখতে হবে, একজন রাসূলপ্রেমিক সাচ্চা মুমিনের দৃঢ়বিশ্বাস এটাই হতে হবে যে মসজিদে হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পর সর্বোত্তম মসজিদ মসজিদে নববী। পৃথিবীর সমস্ত মসজিদের সমন্বিত ফজীলত মসজিদে নববীর সমমানের কস্মিনকালেও হবে না। বরং কোনো মসজিদকে মসজিদে নববীর সাথে তুলনা করাটাই চরম ধৃষ্টতা এবং চূড়ান্ত মূর্খতা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছার প্রতিফলন :

হাদীসের সঠিক মর্ম বোঝার জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর আমলকেও সামনে রাখতে হবে। বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম থেকে রাসূল (সা.)-এর আদর্শবিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ পাবে–সেটা কল্পনাও করা যায় না। তাই হাদীস শরীফের পাশাপাশি সাহাবীগণের আমলও দলিলরূপে গণ্য। কারণ তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহচর। তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেজাজ বুঝতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও কাজের মর্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই তো অনেক চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন বাস্তবায়ন সাহাবীগণের যুগে ঘটবে বলে সহীহ হাদীসে রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট বলে গিয়েছেন,

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

"তোমরা আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে যেমন মাড়ির দাঁত দিয়ে কোনো জিনিস মজবুতভাবে ধরা হয়।" (সুনানে আবী দাউদ, হা. ৪৬০৭)

অপর হাদীসে হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إنى لا أدرى ما بقائى فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدى وأشار إلى أبى بكر وعمر

"জানি না আমি কত দিন তোমাদের মধ্যে থাকব। আমার পরে তোমরা আবুবকর ও উমরের অনুসরণ করবে।" (তিরমিযী, হা. ৩৬৬৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হা. ৪৪৫১, ৪৪৫৫)

ইমাম হাকেম (রহ.) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। হাফেয যাহাবী (রহ.)ও হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (আল মুস্তাদরাক-টীকাসহ-৩/৭৯, ৮০)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) স্বীয় খিলাফত আমলে যখন নারীদের বিগড়ে যাওয়ার অবস্থা উপলব্ধি করলেন এবং ফেতনার আশঙ্কাও দিন দিন বাড়তে লাগল তখন তিনি এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা, ইবনে মাসউদ ও ইবনুয যুবায়ের (রা.)সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নারীদের মসজিদে না আসার আদেশ জারি করলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। কেননা তাঁরা জানতেন যে নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়নি, বরং তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো হুকুমের বিরোধিতা করার কল্পনাও করা যায় না। এতদসত্ত্বেও তাঁরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এ জন্য যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মনোবাসনা এটাই ছিল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.), যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেজাজ বুঝতেন, চাহিদা উপলব্ধি করতেন তাঁর উক্তি থেকেই বিষয়টি প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন,

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل

"নারীরা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা যদি রাসূল (সা.) দেখতেন, তবে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।" (সহীহ বোখারী, হা. ৮৬৯)

বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

لو شاهدت عائشة رضى الله تعالى عنهما ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارا

"বর্তমান যুগে নারীরা শরীয়তবিরোধী যেসব পথ অবলম্বন করছে, পোশাক-পরিচ্ছদ আর রূপচর্চায় তারা যে নিত্যনতুন ফ্যাশন আবিষ্কার করছে, যদি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) এই দৃশ্য দেখতেন তাহলে আরো কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।" (উমদাতুল কারী ৬/১৫৮)

আল্লামা আইনি (রহ.) আরো বলেন,

فانظر إلى ما قالت الصديقة رضى الله تعالى عنها من قولها لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ما أحدثت النساء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبى -صلى الله عليه وسلم - إلا مدة يسيرة على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزأ من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان

"হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.)-এর উক্ত মন্তব্য তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের কিছুদিন পরের নারীদের সম্বন্ধে। অথচ এ যুগের নারীদের বেহায়াপনার হাজার ভাগের এক ভাগও সেকালে ছিল না। তাহলে এ অবস্থা দেখলে তিনি কী মন্তব্য করতেন?" (উমদাতুল কারী ৬/১৫৯)

এখানে চিন্তার বিষয় হলো, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি (রহ.) স্বীয় যুগ তথা হিজরী নবম শতাব্দীর নারীদের সম্বন্ধে এ কথা বলেছেন। তাহলে আজ হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর এ যুগে সারা বিশ্ব যে অশ্লীলতা আর উলঙ্গপনার দিকে ছুটে চলেছে। বেপর্দা আর বেহায়াপনার আজ যে ছড়াছড়ি, মেয়েরা যখন পুরুষের পোশাক পরছে, পেট-পিঠ খুলে রাস্তা-ঘাটে বেড়াচ্ছে, সমানাধিকারের স্লোগান দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলির লঙ্ঘন করছে। বোরকার মতো পবিত্র পোশাকের পবিত্রতা নষ্ট করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এই ফেতনা-ফ্যাসাদের মধ্যে অবলা মা-বোনদের সাওয়াবের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে মসজিদে আর ঈদগাহে টেনে আনার অপচেষ্টা বোকামি বৈ কিছু নয়। অথচ দলিল-প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের নারীদের। প্রশ্ন হলো, এ যুগের নারীরা কি সে যুগের নারীদের মতো? কস্মিনকালেও না। তা সত্ত্বেও সে যুগেই মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে এ যুগের মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে গিয়ে নামাযের জন্য উৎসাহিত করা হবে?

ইমাম ইবনে আব্দিল বার (রহ.) স্বীয় কিতাব 'আততামহীদ'-এ উল্লেখ করেন,

وذكر أبو عمر فى التّمهيد أنّ عمر لما خطبها شرطت عليه ألّا يضربها ولا يمنعها من الحقّ ولا من الصّلاة فى المسجد النبوىّ، ثم شرطت ذلك على الزّبير فتحيّل عليها أن كمن لها لما خرجت إلى صلاة العشاء ، فلما مرّت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت :إنا لله !فسد النّاس !فلم تخرج بعد.

স্ত্রী আতেকা বিবাহের সময় স্বামী উমর (রা.)-কে মসজিদে নববীতে গিয়ে নামাযের অনুমতি দেওয়ার শর্ত করেছিলেন, এ জন্য উমর (রা.) অপছন্দ করা সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারছিলেন না। কিন্তু উমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত যোবায়ের (রা.)-এর সাথে আতেকার বিবাহের পর স্বামী হযরত যোবায়ের (রা.)ও তাঁর মসজিদে যাওয়া অপছন্দ ও নিষেধ করতেন। তারপর কৌশলে তাঁর বের হওয়া বন্ধ করেন। একদিন যখন আতেকা এশার সময় বের হলেন যোবায়ের (রা.) লুকিয়ে তাঁর পশ্চাৎদেশে খোঁচা দিলেন। ওই দিন আতেকা (রা.) ঘরে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর পানাহ! মানুষ বিগড়ে গিয়েছে। অতঃপর আর কোনো দিন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হননি। (আল ইসাবাহ ৮/২২৮)

হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা :

অনেকে একটি হাদীসের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মসজিদে গিয়ে নারীদের নামায আদায় সুন্নাত বা সাওয়াবের কাজ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে থাকে। হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

আল্লাহর বান্দিদের আল্লাহর মসজিদ থেকে নিষেধ করো না। (বোখারী, হা. ৪৪২)

এক শ্রেণীর লোক হাদীসের শাব্দিক অনুবাদ থেকে এটাই বোঝে যে মসজিদে গিয়ে নারীদের নামায পড়া সুন্নাত। তাদের মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না। এটা অন্যায়-গোনাহের কাজ।

সঠিক ব্যাখ্যা :

হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা জানার আগে হাদীসটির মতন 'মূল ভাষ্য' জেনে নেওয়া সমীচীন। হাদীসের কিতাবপত্র অধ্যয়ন করলে হাদীসটির মতনে 'মূল ভাষ্যে' কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে সূত্র, অর্থাৎ বর্ণনাকারী সাহাবী একজন। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে

উমর (রা.)। নিম্নে বর্ণনাগুলোর ভিন্নতা তুলে ধরা হলো। এক বর্ণনায় আছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، إذا استأذنوكم

উভয় হাদীসের শাব্দিক অর্থ একই। অর্থাৎ তোমাদের কোনো স্ত্রী লোক তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে নিষেধ করো না। (বোখারী, মুসলিম)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن

তোমাদের স্ত্রী লোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য ইবাদতের সর্বোত্তম স্থান। (আবু দাউদ : ৫৬৭)

পর্যালোচনা :

ওপরে আমরা ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে একই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের চার ধরনের মতন তথা মূল ভাষ্য পেলাম। যার থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট বুঝে আসে।

এক. নামাযের জন্য নারীদের মসজিদে গমন করা ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা নফল কোনো বিধানের আওতায় পড়ে না। কেউ এই হাদীস দ্বারা কোনো একটি বিধানের প্রমাণ করার চেষ্টা করলে সেটা হবে তার দ্বীনি জ্ঞানের ব্যাপারে দৈন্যতার প্রমাণ। কারণ কেউ যদি কাউকে বলে, তুমি অমুককে অমুক স্থানে যেতে বাধা দিয়ো না। এর অর্থ এই নয় যে অমুকের জন্য সেখানে যাওয়া জরুরি বা অন্য কিছু। চিন্তা করলে দেখা যাবে, বাধা দেওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। তবুও বিশেষ কোনো কারণে বাধা না দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আর সেই বিশেষ কারণটি হলো সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শরীয়তের বিধিবিধান শেখা ও জানা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে এ কারণটিও রহিত হয়ে যায়।

দুই. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো নারী ধর্মীয় কাজের জন্যও ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

তিন. কোনো নারী নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী বা অভিভাবক তাকে অনুমতি দিতে বাধ্য নয়। বরং যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করবে যে নারীদের জন্য ঘরে অবস্থান করা এবং ঘরের নির্জন কক্ষে নামায আদায় করা মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেয়ে অনেক বেশি ফজীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে وبيوتهن خير لهن 'তাদের ঘরই ইবাদতের সর্বোত্তম স্থান' বলে স্বামী ও অভিভাবকদের এই দিকনির্দেশনাই দিয়েছেন এবং নারীদের এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মসজিদ নয়, ঘরই হলো তাদের নামাযের সর্বোত্তম স্থান। হাদীসের মূল ভাষ্যে সামান্য চিন্তা করলেই এই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া এ মর্মে আরো কিছু হাদীস ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

চার. শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো, হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী যদি নিজেই তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করেন, তাহলে ওই হাদীসটি আমল ও প্রমাণযোগ্য থাকে না। বরং বুঝতে হবে হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে অথবা সাধারণ মানুষ বাহ্যিকভাবে যা বোঝে হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র তা নয়, অন্য কিছু। বা বুঝতে হবে হাদীসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

ইবনে উমর (রা.)-এর আমল :

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে হাদীসটি ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। আরো উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য আগত নারীদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতেন এবং তাদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। অন্য আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হবে, তিনি পরিবারের নারী সদস্যদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘর থেকে বের হতে দিতেন না। এ ছাড়া তাঁর সূত্রে এই হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে যে নারীদের জামাতে কল্যাণ বলতে কিছু নেই।

ইবনে উমর (রা.)-এর বাস্তব আমল তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়াটা কি এই বার্তা বহন করে না যে হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে বা প্রয়োগ ক্ষেত্র বাহ্যিকভাবে যা বুঝে আসে তা নয় বরং অন্য কিছু। এর পরও একটি মহল মসজিদে নারীদের নামাযের ব্যবস্থার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেপড়ে লাগা সরলমনা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা ও গভীর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ।

পাঁচ. রাষ্ট্রপ্রধান, ইমাম ও অভিভাবকদের দায়িত্ব।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনে হজর মক্কী (রহ.) বলেন,

أنه حيث كان فى خروجهن اختلاط بالرجال فى المسجد، أو طريقه، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج، وعلى الحليل الإذن لهن، ووجب على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك

"যখন মসজিদে বা পথে পুরুষের সাথে মেলামেশা অথবা নারীদের অত্যধিক রূপচর্চা বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার কারণে ফিতনার আশঙ্কা হয় তখন তাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে

মসজিদে যাওয়া হারাম এবং তারা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বামী বা অভিভাবকদের অনুমতি প্রদান করাও হারাম। আর রাষ্ট্রপ্রধান, ইমাম বা তাঁদের প্রতিনিধিগণের ওপর নারীদের মসজিদে আসা নিষেধ করা ওয়াজিব।" (মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৮৩৬)

এই দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রপ্রধান, ইমাম, খতীব ও অভিভাবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মসজিদের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও ব্যবস্থাপকগণকেও এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঈদের নামাযে নারীদের অংশগ্রহণ :

জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ঈদের নামাযের জন্যও নারীদের ঘর থেকে বের করে আনার অপতৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈগণের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১.

عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساء ه فى العيدين

হযরত ইবনে উমর (রা.) তাঁর স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা. ৫৭৯৫) সনদের বিচারে হাদীসটি হাসান।

২.

عن إبراهيم، قال :يكره خروج النساء فى العيدين

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) দুই ঈদে নারীদের বের হওয়াকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা. ৫৭৯৪) সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

৩. আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.) বলেন,

كان القاسم، أشد شيء على العواتق، لا يدعهن يخرجن فى الفطر والأضحى

ইমাম কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) নারীদের ব্যাপারে অনেক কঠোর ছিলেন, নারীদেরকে কখনো ঈদুল ফিতর ও আজহার সময় বের হতে দিতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা. ৫৭৯৭)

৪. হজরত হিশাম ইবনে ওরওয়া (রহ.) বলেন,

أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى

তাঁর পিতা ওরওয়া ইবনে যুবায়ের পরিবারের কোনো নারীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাযে যেতে দিতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা. ৫৭৯৬) সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি সহীহ।

৫.

عن نافع أنه كان لا يخرج نساء ه فى العيد "

হজরত নাফে (রহ.) তাঁর ঘরের নারীদেরকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হা. ৫৭২৪) সূত্রের বিচারে হাদীসটি সহীহ।

দুটি সন্দেহ ও তার নিরসন :

সন্দেহ : ১. কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদি বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়া ফেতনার আশঙ্কায় নিষেধই হয় তাহলে রাসূল (সা.) স্পষ্ট এ কথা বলে যাননি কেন যে আমার যুগের পর নারীদের মসজিদে আসা নিষেধ?

নিরসন : এর নিরসন হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীয়তের অসংখ্য বিধানাবলির ক্ষেত্রেই এরূপ করে গিয়েছেন যে তা স্পষ্ট করে বলে যাননি। তিনি জানতেন ও বুঝতেন যে প্রিয় সাহাবীগণ তাঁর সকল কথার মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝেই পরবর্তীতে আমল করবেন। তাই সব কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে আবুবকর (রা.)-কে খলিফা বানানোর কথা স্পষ্ট বলে যাননি। কেননা তিনি বুঝেছেন যে তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিতে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছেন, এখন আর তাঁদের তা স্পষ্ট বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের আলোচিত বিষয়টিও তদ্রূপ। নারীদের ফেতনা ও নারীদের পর্দাসংক্রান্ত শত শত হাদীস থাকা সত্ত্বেও সাহাবীগণ এ বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছা বুঝবেন না, তা অসম্ভব।

সন্দেহ : ২. অনেক ভাই বলে থাকেন যে মক্কা-মদীনার হারামাইন শরীফে নারীগণ মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নিরসন : আসলে হারামাইনে কিছু জরুরতের ভিত্তিতে নারীগণের জামাতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা হলো, নারীগণ যেহেতু মক্কার মসজিদে হারামে তাওয়াফের জন্য আসতে হয় এবং মদীনার মসজিদে নববীতে জিয়ারতের জন্য এসে থাকেন। এমতাবস্থায় নামাযের আযান হয়ে গেলে বের না হয়ে মসজিদের জামাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। উলামায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। তবে শুধুমাত্র জামাতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নারীগণ হারামাইনে যাওয়ারও অনুমতি নেই। বর্তমানে না জেনে অনেক নারী শুধু নামাযের জন্যই হারামাইনে উপস্থিত হয়ে থাকেন, তা ঠিক নয়। (দেখুন : ই'লাউস সুনান ৪/২৩১)

তাঁরা নিজেদের হোটেলে নামায আদায় করলে মসজিদে হারামে নামায পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে। যা হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মুসাফির

বেগম মুজাহিদুল ইসলাম
টেকনিক্যাল মোড়, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার গ্রামের বাড়ি মিরসরাই, যা চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৬ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। আমার বাবা সেখানে একটি ঘর নির্মাণ করেন। যাতে ঈদের সময় গ্রামে গেলে সেখানে থাকা যায়। ছোটকাল থেকেই আমি চট্টগ্রাম শহরের হালিশহর এলাকায় থাকি। ১৪-১৫ বছর হলো বাবা আরেকটি বিল্ডিং করেন হালিশহরে স্থায়ী বসবাস করার জন্য। ইত্যবসরে আমার বিবাহ হয় মিরসরাই নিকটবর্তী খইয়াছড়া গ্রামের এক ছেলের সাথে। এ হিসেবে তা শ্বশুরবাড়ি। স্বামীর চাকরির সুবাদে ঢাকার মিরপুর টেকনিক্যাল মোড়ে বর্তমানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। আমার শাশুড়িও আমাদের সাথে থাকেন। আমার জানার বিষয় হলো, যদি আমি মিরসরাই খইয়াছড়া বা হালিশহর যাই তাহলে কোন কোন জায়গায় কসরের নামাজ পড়ব? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাতে সরাসরি আপনার পিতার বাড়ি তথা মিরসরাই ও হালিশহর গেলে কসরের নামাজ পড়বেন। আর আপনার শ্বশুরবাড়ি তথা খইয়াছড়া গেলে অথবা খইয়াছড়া যাওয়ার পর মিরসরাই ও হালিশহর গেলে পুরা নামায পড়বেন। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৩১, ইমদাদুল ফতওয়া-১/৫৭৯, কিতাবুন নাওয়াযেল-৫/৪৫২)

প্রসঙ্গ : মুসাফির

মুহা. শামসুদ্দিন
চরফ্যাশন, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

১। বাংলাদেশ বর্তমানে কয়েকটি অংশে গঠিত। যেমন–রাজধানী, সিটি, বিভাগ, জেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, গ্রাম, ওয়ার্ড, পাড়া ইত্যাদি। যেমন একটি ইউনিয়নের নাম হাজারীগঞ্জ। এই ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম পশ্চিম এওয়াজপুর, যা ১৩টি ওয়ার্ড মিলে গঠিত। এখন যদি ১ নং ওয়ার্ডের কোনো ব্যক্তি সফরের নিয়্যাতে নিজ বাড়ি থেকে বের হয় তাহলে সে কোন জায়গা থেকে মুসাফির হবে। তার ১ নং ওয়ার্ড থেকে ২ নং ওয়ার্ডে প্রবেশের পর, নাকি পশ্চিম এওয়াজপুর গ্রামটি অতিক্রম করার পর। অনুরূপভাবে যারা থানা বা পৌরসভায় বসবাস করে তারা কখন মুসাফির হবে?

২। ঢাকা মহানগর দুই সিটি হওয়ার কারণে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শহর হিসেবে ধর্তব্য হবে নাকি এক শহর? এবং বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী কোনো লোক যদি ভোলার উদ্দেশে সফর করে তাহলে সে কোন স্থান থেকে নামায কসর করবে?

সমাধান-১

সফরের নিয়্যাতে নিজ এলাকা তথা পশ্চিম এওয়াজপুর গ্রাম অতিক্রম করার দ্বারা মুসাফির হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে যারা থানা বা পৌরসভায় বসবাস করে তারা থানা সদর ও পৌরসভার সীমানা অতিক্রম করার দ্বারা মুসাফির হয়ে যাবে। (মজমাউল আনহুর-১/২৩৮, আল ফিকহুল হানফি ফী সাওবিহিল জাদিদ-১/৩১১)

সমাধান-২

ঢাকা মহানগরকে সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে দুটি সিটি করলেও সরকারিভাবে তা এক ও অভিন্ন শহর ধরা হয়। তাই ঢাকা মহানগর একটি শহর। অতএব বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী ভোলার উদ্দেশে নৌপথে সফর করলে আর লঞ্চ ছেড়ে দিলে শহরের সীমা পার হওয়ার পর কসর করবে, আর সড়কপথে যাত্রা করলে ঢাকা সিটির নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করলে কসর করতে হবে। (রদ্দুল মুখতার-২/১২১, ইমদাদুল আহকাম-১/৭১০, কিতাবুন নাওয়াযিল-৫/৪০৭)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা. আফজাল হোসেন
পাঠানপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জিজ্ঞাসা :

আমি শিক্ষকতা হতে অবসর গ্রহণ করায় অবসর ভাতা পেয়েছি ১৩ লাখ টাকা, সাংসারিক কাজে ব্যয় হয়েছে ৬ লাখ টাকা, এখন বাকি আছে ৭ লাখ টাকা। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমার ওপর হজ ফরয কি না?

উল্লেখ্য, আমার বড় মেয়ের ঘরে বিবাহ উপযুক্ত একজন নাতনি রয়েছে, যাকে বিবাহ দেওয়া তার বাবার পক্ষে সম্ভব না। এখন উক্ত টাকা নাতনির বিয়েতে

ব্যয় করব, না হজ করব?

সমাধান :

হ্যাঁ, আপনার ওপর হজ ফরয। উক্ত টাকা হজের জন্যই ব্যয় করতে হবে। হজের কাজ সম্পাদন করার পর কিছু বেঁচে থাকলে তা নাতনির বিয়েতে ব্যয় করতে পারেন। (ফাতাওয়ায়ে নাওয়াযেল-১৫৬, মাজমাউল আনহার-১/২৫৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২১৭)

প্রসঙ্গ : তালাক

কাজী নাযমুশ শাহাদাত
গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমার স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হয়ে উভয়ে কথাকাটাকাটির মাঝে রাগের বশবর্তী হয়ে আমার স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম এবং আজ হতে তুমি আমার জন্য হারাম এবং আমি তোমার জন্য হারাম উচ্চারণ করি। অতএব হুজুর সমীপে নিবেদন এই যে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় উভয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চাই। কোরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক সুপরামর্শ ও সমাধান দানে আপনাদের সুমর্জি কামনা করছি।

সমাধান :

তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি অপছন্দনীয় কাজ। সামাজিকভাবেও এটা ঘৃণিত, কথায় কথায় বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া বিশেষভাবে একসাথে তিন তালাক দেওয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং নারী নির্যাতনের শামিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত। এতদসত্ত্বেও কেহ নিজ স্ত্রীকে উদ্দেশ করে স্বজ্ঞানে, স্বাভাবিক অথবা রাগান্বিত অবস্থায় তালাকের উদ্দেশ্য হোক বা না হোক তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আপনি স্ত্রীকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম শব্দ উচ্চারণ করায় আপনার স্ত্রীর ওপর তা পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। অতএব আপনি যদি পুনরায় তার সাথে ঘর-সংসার করতে চান তাহলে শরয়ী হালালা আবশ্যক। তার পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (সূরা বাকারা-২৩০, তফসীরে কুরতুবী-৩/৯৭, বুখারী শরীফ-২/৭৯১)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা. মাহফুজুর রহমান
ক্যাডেট কলেজ, পাবনা।

জিজ্ঞাসা :

কোনো ব্যক্তি চাকরি করে কিন্তু চাকরির নিয়ম অনুযায়ী সে ২৪ বছরের আগে বিবাহ করতে পারবে না। এখন ওই ব্যক্তি যদি কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তার শারীরিক প্রয়োজনে বিবাহ করে তাহলে শরীয়তের হুকুম কী হবে?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে অনেক গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি বিবাহ করার দ্বারা যদি চাকরির দায়িত্ব আদায়ে কোনো রকম ত্রুটি না হয়। বরং জিম্মাদারি ঠিকমতো পালন করতে পারে। তবে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তার শারীরিক প্রয়োজনে বিবাহ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। আর শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক এমন নিয়ম মানা জরুরি নয়। (বজলুল মাজহুদ-১১/৩২০, রদ্দুল মুহতার-৩/৬, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৬/৫১)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

হাজী ইউনুছ আলী
গাজীপুর সদর।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের ভেতরে তালেবুল ইলমদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি জায়েয আছে কি? এমনিভাবে মসজিদের জায়গায় মাদরাসার আফিস করার হুকুম কী? দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

মসজিদকে বাসস্থান বানানো জায়েয নেই। তবে অতি প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের পরিপূর্ণ আদব-ইহতেরাম বজায় রেখে তালেবুল ইলমদের লেখাপড়া থাকা-খাওয়ার অবকাশ আছে। শুধু মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করা জায়গায় মাদরাসার স্থায়ী অফিস বানানো জায়েয নেই। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ন্যায্য ভাড়া দিয়ে অস্থায়ী অফিস বানানো যাবে। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/৪১৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৯৬, কেফায়াতুল মুফতী-১/৩৭১)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুছা. শামীমা আক্তার সীমা
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি শামীম আক্তার সীমা গত

২৬/০২/১৯৮২ ইং তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই জনাব আজিজুর রহমানের সহিত। পারিবারিক ঝগড়াবশত আমরা উভয়েই বিচ্ছেদবশত আলাদা হয়ে পড়ি গত ২০০৭ সালে। অতঃপর আমি রাগবশত আমার স্বামীকে তালাক দিই (পারিবারিক আইন মোতাবেক)। অতঃপর আমার স্বামী তালাককে আটকানোর প্রেক্ষিতে কোর্টে মামলা দায়ের করেন, কোর্টের জটিলতায় ও অনুপযুক্ত সময় দেওয়ার কারণে আমাদের কেউই কোর্টে হাজিরা দিইনি। অতঃপর মামলা খারিজ হয়ে যায় এবং তালাক কার্যকর হয়ে যায়, তালাকনামা নিবন্ধিত এই আবেদন এর সাথে তালাক কার্যকর হয় ১৪/১২/২০১১ থেকে। এখন অনুশোচনা বোধ থেকে আমরা উভয়েই আবার একত্রে সংসার করার সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় আমরা কেউই সফলকাম হতে পারছি না। আমি এবং আমার স্বামী ধর্মীয় রীতিকে উপেক্ষা করতে নারাজ তাই ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কী করণীয় তা জানিয়ে বাধিত করবেন, আমি এবং আমার স্বামী জানতে ইচ্ছুক যে আমাদের একত্র হতে হলে ধর্মীয় মাসআলা কী আদেশ করে এবং ইহা আদৌ সম্ভব কি না?

সমাধান :

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা শরীয়ত কর্তৃক স্বামীকে প্রদান করা হয়েছে স্ত্রীকে নয়, তবে স্বামী নিজ স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে বা বিনা শর্তে তালাক গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্পণ করলে স্ত্রী উক্ত ক্ষমতাবলে তা গ্রহণ করতে পারবে। প্রশ্নের বিবরণ ও সংযুক্ত নিকাহনামা ও তালাকনামার বিবরণ অনুযায়ী আপনি স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হয়ে তালাক গ্রহণ করায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এক তালাক পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আপনার স্বামী ইদ্দতের মধ্যে আপনাকে ফিরিয়ে না নেওয়ায় সে তালাকটি বায়েনে পরিণত হয়েছে, তাই বর্তমানে আপনারা আবার ঘর-সংসার করতে চাইলে নতুন মোহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করতে হবে। (দুররুল মুহতার-৩/৩২৩, হিদায়াহ-২/৩৭৫, জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া-৪/৩৭৩)

প্রসঙ্গ : হজ

মুফতী হাবিবুল্লাহ
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

এক মহিলার ওপর হজ ফরয। শারীরিকভাবেও তিনি সুস্থ এবং সাথে যাওয়ার মতো মাহরাম পুরুষও আছে। তিনি ওই মাহরাম পুরুষের খরচাদি বহন করতেও সক্ষম। জানার বিষয় হলো, উক্ত মহিলা ছবি তোলা, ক্ষেত্রবিশেষ পর্দা লঙ্ঘন ও ভিড়ের মাঝে চলাফেরাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে নিজে হজ না করে কারো মাধ্যমে হজে বদল করিয়ে নিলে তার হজ আদায় হয়ে যাবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

মহিলার ওপর হজ ফরয হয়ে থাকলে সে শারীরিকভাবে হজ করতে সক্ষম ও সাথে মাহরাম থাকাবস্থায় নিজের হজ নিজে করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে বদলি হজ করানোর অনুমতি নেই। তবে হজ করার ক্ষেত্রে ছবি তোলা বাধ্যতামূলক হলে আইনি প্রয়োজনে ছবি তোলার কারণে মহিলা গোনাহগার হবে না। অনুরূপভাবে ফরয হজ আদায় করার ক্ষেত্রে মহিলাগণ যথাসাধ্য পর্দার বিধান রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে। (সূরা আলে ইমরান-৯৭, জাওয়াহিরুল ফিকাহ-৩/২৩২, মুআল্লিমুল হুজ্জাজ-১২২)

প্রসঙ্গ : হেবা

মুহা. আব্দুল্লাহ
উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করল তার দশজন ছেলেমেয়ের নামে। বাড়ির সাথে পাঁচটি দোকানও আছে। উক্ত দোকানগুলোর ভাড়া কে গ্রহণ করবে বাবা, না সন্তান। বর্তমানে এই বাড়িটির মালিক কে–বাবা না সন্তানরা? যেহেতু বাবা এখনো জীবিত আছেন।

সমাধান :

ক্রয়কৃত বাড়িটি ছেলেমেয়েদের দখলে বুঝিয়ে না দিয়ে থাকলে শুধুমাত্র তাদের নামে ক্রয় করার দ্বারা তারা মালিক হবে না। এমতাবস্থায় বাবা নিজেই ওই বাড়ি এবং দোকানের মালিক বলে গণ্য হবেন। (রদ্দুল মুহতার-৫/৯৩-৬৯২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৩৭৮, কিফায়াতুল মুফতী-১১/৪২৭)

প্রসঙ্গ : হেবাদান

মুহা. হেলাল মিয়া
গলোহা, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

আমার পরিবারে মা দুজন, প্রথম মার চার ছেলে, দ্বিতীয় মার এক মেয়ে, এক ছেলে। দ্বিতীয় মাকে তালাক দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়েসহ তিনি বাবার বাড়ি চলে যান। এখন আমার বাবা চার ভাইকে বাবার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চান দ্বিতীয় মার এক ছেলে ও এক মেয়ে ব্যতীত। আমাদের ওই সম্পত্তি নেওয়া

জায়েয হবে কি না এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনাদের পিতা বিহীত কোনো কারণ ছাড়া শুধু তাদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে সমস্ত সম্পত্তি হেবা করে আপনাদের ভোগদখলে দিয়ে দিলে আপনারা মালিক হয়ে গেলেও তিনি গোনাহগার হবেন। তাই তিনি যেন এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন বরং সব সন্তানকে বরাবর সম্পত্তি দেন এ জন্য তাঁকে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। (দুররুল মুখতার-৫/৬৯৬, বাহরুর রায়েক-৭/৪৯০, ইমদাদুল আহকাম-৪/৫৪)

প্রসঙ্গ : সুদমুক্ত ব্যাংক

মুহা. রকিবুল হক
টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা :

১। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত মুদারাবা মাসিক উপার্জন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা জায়েয হবে কি?

২। এছাড়া কোরআন ও হাদীস মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকে কোনো বিনিয়োগের ব্যবস্থা থাকলে দয়া করে জানাবেন।

সমাধান-১

বাংলাদেশে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা, মুরাবাহাসহ অন্যান্য লেনদেন শরয়ী পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাবি করে থাকে। তদারকির জন্য প্রত্যেক ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন শরীয়াহ বোর্ডও রয়েছে। সুতরাং এ দাবির বরখেলাফ প্রমাণিত না হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে মুদারাবাসহ অন্যান্য লেনদেন করাকে নাজায়েয বলা যাবে না। (বদায়েউস সানায়ে-৮/২৪, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/২৮৮)

সমাধান-২:

আমাদের জানা মতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহে ডিপজিটরদের জন্য মুদারাবা ব্যতীত শরীয়ত মোতাবেক অন্য কোনো বিনিয়োগব্যবস্থা নেই। (মজমাউল আনহার-৩/১১৯, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৭/৩৭১)

প্রসঙ্গ : সুদমুক্ত ব্যাংক

মুহা. মোতাহার হোসেন খান
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার নিকট কিছু টাকা আছে। এই টাকাগুলি আমার অসুস্থতার কারণে অন্য কোনো ব্যবসাতে ও বিনিয়োগ করার মতো রাস্তা না পাওয়ার দরুন আমি বাংলাদেশের যেকোনো ইসলামী ব্যাংকে প্রতি মাসে লাভের নিয়মে MTDR বা মেয়াদি হিসাবে জমা রাখার জন্য মনস্থ করেছি। এই টাকাগুলি ব্যাংকে জমা রাখার জন্য প্রতি মাসে আমাকে যে টাকা তারা লাভ হিসেবে দেবে। তা আমার জন্য কি হালাল হবে? নাকি সুদ হিসেবে হারাম হবে?

সমাধান :

যেহেতু আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরয়ী পদ্ধতিতে মুদারাবার ভিত্তিতে টাকা জমা করা ও লভ্যাংশ প্রদানের দাবি করে থাকে এবং এর জন্য বিজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শও গ্রহণ করে থাকে তাই এর বিপরীত কোনো কিছু প্রমাণিত না হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহে টাকা বিনিয়োগ করলে তাদের মুনাফাকে হারাম বলা যাবে না। তবে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে তাদের লেনদেনে সন্দেহ হলে বেঁচে থাকাই শ্রেয়। (সূরা বাকারাহ-২৭৫, ফতহুল কদির-৭/৪৩২, বাদায়েউস সানায়ে-৬/৮০)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

শিউলী আক্তার

জিজ্ঞাসা :

একজন মেয়ে মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালিয়ে গিয়ে কাজি অফিসে নিজ পরিবারের কোনো অভিভাবক ছাড়া দ্বীনদার নই এমন এক ছেলেকে বিবাহ করেছিল। এভাবে বিয়ে হওয়ার কয়েক দিন পরে ছেলেটি মেয়েকে নিয়ে ছেলের বাড়িতে ওঠে। তারপর ছেলেটি মেয়ের বাবাকে সমস্যা সমাধান করতে ডাকলে মেয়ের বাবা ওই বাড়িতে যায় এবং কাবিনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং কাবিননামা দেখতে চেয়ে মেয়েকে ওই বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। পরে মেয়ের বাবা কাবিনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সামাজিকভাবে আবার নতুন করে কাবিন করতে চাইলে ছেলেপক্ষ ১ ভরি সোনা এবং একশ জন লোক খাওয়ানোর দাবি করে। এ কারণে এবং আরো অন্য কারণে মেয়ের বাবা বুঝতে পারে ছেলে এবং ছেলের পরিবার ভালো না। তাই মেয়েকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মেয়ে আবার বাবার অবাধ্য হয়ে বাবার বাড়ি ছেড়ে ওই ছেলের কাছে চলে যায়। কয়েক বছর সংসার করার পর একটি বাচ্চা হলে মেয়ের বাবা মেনে নেয়। এ অবস্থায় তারা সংসার করতে থাকে তখন তাদের সংসারের বয়স ১০ বছর এবং বাচ্চার বয়স ৫ বছর। বিয়ের সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্যসমূহ–

১। ছেলে নামায ও ফরয রোযা পালন

করত না। পক্ষান্তরে মেয়ে ফরয রোযা রাখত কিন্তু নামাযে কিছুটা গাফেল ছিল।

২। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ছেলে ও মেয়ের পরিবারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল।

উল্লেখ্য, বিয়ের সময় মেয়ে মৌখিকভাবে কবুল বলেনি। কাবিননামায় লিখিত দিয়েছে। এ অবস্থায় তাদের বিবাহ কি সহিহ হয়েছে? না হলে করণীয় কী? হাওয়ালাসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

বিবাহের আকদ মেয়ের পিতা বা উকিলের মাধ্যমে না হয়ে পাত্র-পাত্রী সরাসরি করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব ও কবুল তথা পাত্র-পাত্রীর বিয়ের স্বীকৃতির প্রকাশ মৌখিকভাবে হওয়া জরুরি। শুধু কাবিননামায় লিখিত দেওয়ার দ্বারা বিবাহ হয় না। বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে মেয়ে মৌখিক কবুল না করে কাবিননামায় লিখিত দেওয়ার কারণে তাদের মাঝে উল্লিখিত বিবাহ সংঘটিত হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় হলো পুনরায় বিশুদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং এ পর্যন্ত তাদের মাঝে যে বৈবাহিক আচরণ হয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা করা।

উল্লেখ্য, তাদের সন্তানটি বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার-৩/১২, আল-বাহরুর রায়েক-৩/১৪, বেনায়াহ-৫/৬)

প্রসঙ্গ : মুরাবাহা

মুহা. হুমায়ুন
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ প্রয়োজন পূরণে আমি ইসলামী ব্যাংক বাড্ডা শাখার সাথে আলোচনা করি। তারা বাইয়ে মোরাবাহা তথা ২০০০০০ টাকার পণ্য কিনে ২২৮০০০ টাকার এক বৎসরের সময়ে আমার নিকট বিক্রি করবে এবং আমাকে এই অর্থ ১ বৎসরে পরিশোধ করতে হবে, যদি আমি এক বৎসরের পূর্বে যেকোনো মাসে আদায় করি তাহলে ২১৪০০০ টাকা আদায় করতে হবে। বাকি ১৪০০০ টাকা কর্তন করা হবে এবং তা সময় কমে আসার কারণে। তবে আকদ করা হবে একটি শর্ত সাপেক্ষে আর তা হলো আমার বাড়ির দলিল ব্যাংকের নিকট জমা রাখতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে না পারলে আমাকে আরো তিন মাস সময় দেওয়া হবে। এর পরও অক্ষম হলে তারা বাড়ি বিক্রি করে নিজ অর্থ আদায় করবে আর পণ্য হালাল বস্তু। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এমনভাবে ব্যাংক থেকে পণ্য কেনা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় বিকল্প পদ্ধতি জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাস্তবে দুই লক্ষ টাকার পণ্য খরিদ করে গ্রাহকের নিকট মূল্য পরিশোধের সময়-সীমা নির্ধারণ করে মুনাফা ধার্য করে বিক্রয় করলে তা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে। (ইসলাম আউর মাআশি মাসায়েল-৬/৩০, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৭/৪৯)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মাও. গোলাম রব্বানী
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

জিজ্ঞাসা :

মনে করেন, আমি আমার নিজস্ব জমি থেকে কিছু জমি সেবামূলক কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্ফ করে দিতে চাই। মুসলিম শরীফের ৪০৮৯ ওয়াক্ফ হাদীসকে সামনে রেখে এই শর্তে যে কেউ কোনো দিন ওই জমি বিক্রি করতে পারবে না, এমনকি ওয়াক্ফদাতা নিজেও না। শুধুমাত্র পরিচালনা করতে পারবে এবং ওই প্রতিষ্ঠান থেকে যা আয় হবে সম্পূর্ণ সেবামূলক কাজে ব্যবহার হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি আমার ওই জমিটি কিভাবে ওয়াক্ফ করব? নতুন করে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নাকি পুরনো কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে দেব?

সমাধান :

ওয়াক্ফ করার জন্য প্রতিষ্ঠান নতুন বা পুরাতন হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিধায় আপনি উক্ত জমিটি নতুন বা পুরাতন কোনো শরীয়তসম্মত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এভাবে ওয়াক্ফ করতে পারেন–আমি উক্ত জমিটি অমুক প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করলাম যে, উক্ত জমিটি বিক্রি করা, পরিবর্তন করা, হেবা করা বা মিরাছ সূত্রে বণ্টন করা নিষিদ্ধ। এভাবে ওয়াক্ফ করার দ্বারা ওয়াক্ফ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে এখন আর কেউ তা বিক্রি বা পরিবর্তন করতে পারবে না। এমনকি ওয়াকফকারীও না। শুধু পরিচালনা করতে পারবেন। তবে পরিচালনার জন্য ওয়াক্ফনামায় যদি কোনো মোতাওয়াল্লী নির্ধারণ না করেন তাহলে পরিচালনার অধিকার আপনার কাছেই থাকবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫১, হিন্দিয়া-২/৩৫৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/৫১৮)

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-৯

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ইসলামী আকীদাসমূহে কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা খুবই দীর্ঘ। বিশেষ করে অনেক বাতিল ফিরকা আকীদার বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক বিষয়কে মূল আকীদা বানিয়ে বাহারি অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি-দ্বন্দ্ব এবং ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে ইসলামের শুরুলগ্ন থেকেই। আবার মূল আকীদার ক্ষেত্রেও অনেকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদের গোমরাহ করার চেষ্টা করেছে। এসব বাতিল আকীদা প্রতিরোধে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমামগণ প্রত্যেকটি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সহীহ আকীদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেরূপ বিষয়গুলো দীর্ঘ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আবার উলামায়ে কেরাম ইসলামের মৌলিক ও সহীহ আকীদাগুলো একত্র করে সংক্ষিপ্ত আকারেও উপস্থাপন করেছেন। যাতে সর্বসাধারণের জন্য ইসলামের সহীহ আকীদাগুলো জানতে-বুঝতে সহজ হয়। এবারের আয়োজনে আমরা একনজরে ইসলামী আকীদাগুলো উল্লেখ করেছি। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরায় প্রতিদিন এই আকীদাগুলো মসজিদে পড়ে শোনানো হয়। যাতে ইসলামের সহীহ ও মৌলিক আকীদাগুলো অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়। একজন মুসলমান তার ইসলাম ও ঈমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই আকীদাগুলো অবশ্যই দৃঢ়ভাবে অন্তরস্থ রাখতে হবে।

ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে যত বাতিল ফিরকার আগমন ঘটেছে প্রত্যেকের কিছু প্রতীকী আমল যেমন ছিল, তেমনি কিছু নির্দিষ্ট বাতিল আকীদাও ছিল। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, ভিন্নমত সৃষ্টির জন্য আমলের পাশাপাশি কিছু আকীদাও না হলে মতভেদটা প্রকট হয় না। হয়তো মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির বিধর্মী পরিকল্পনা যুগ যুগ ধরে এভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে এসেছে। তাই ইতিহাস এবং বাস্তবে যেসব বাতিল পথ ও মত দৃষ্টিগোচর হয় সবার ক্ষেত্রে একই রীতি লক্ষ করা যায়। আমলের বিষয়ে ভিন্নমত সৃষ্টি করে পরস্পরকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়। আবার আকীদার ক্ষেত্রে ভিন্নমত সৃষ্টি করে পরস্পরকে কাফের আর মুশরিক বলে সম্বোধন করা হয়। এভাবেই মূলত মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নমত, দ্বন্দ্ব এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ মুসলমানগণ সামান্য সচেতন হলে এবং দ্বীনি বিষয়ে ইলম অর্জনের ব্রতী হলে ভিন্নমত সৃষ্টি এবং চর্চার অবকাশ থাকে না।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম বাতিল এবং হকের মাপকাঠি হিসেবে তিনটি যুগ বা স্তরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিন স্তরের মধ্যে যে আমল ও আকীদাগুলোর চর্চা ছিল সেগুলোই হক এবং সহীহ। এর পরের আমল এবং আকীদাগুলোকে বিদ'আত বা ফেতনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহ এবং ইজমা-কিয়াসের দলিল দ্বারাই মূলত এই বাস্তবতা সাব্যস্ত। যারা এই তিন যুগের আমল ও আকীদা পোষণ করবে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। এই ধারাটি হলো–১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ২. সাহাবায়ে কেরাম, ৩. তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ইমাম মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ। মূলত পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ এই মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করেই নিজের মত-পথ ও দলকে হক-নাহক হিসেবে সহজে পরিচয় করতে পারে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই তিন যুগকেই প্রকৃত ইসলাম এবং সহীহ আকীদার মডেল হিসেবে উল্লেখ করে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী মাপকাঠি বাতলে দিয়েছেন।

তাই ইসলামী আকীদা বা যেকোনো আমলকে ওই মাপকাঠির ওপর বিচার-বিশ্লেষণ করা আমাদের জন্য জরুরি। দ্বীনি যে আমল বা আকীদার ক্ষেত্রে ওই ধারাবাহিকতা থাকবে না মনে করতে হবে সেটা বাতিল। তদ্রূপ কোরআন-হাদীসের যে ব্যাখ্যা উক্ত ধারাবাহিকতার পরিপন্থী হবে, সেটাও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আমল, আকীদা এবং কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় এই ধারাবাহিকতাই মূলত ইসলামের মজবুত দুর্গ। দুর্ভেদ্য প্রাচীর। বিভিন্ন বাতিল ফিরকা তাদের প্রথম খোঁচায় এই স্তরগুলোর যেকোনো একটিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেছে। সেই নিরিখেই ইমাম মুজতাহিদ মুহাদ্দিস এবং উলামায়ে কেরাম তাদের বাতিল বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ শুধু কোরআনের কথা বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ও সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। আবার কেউ ইমাম মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দিসদের বাদ দিয়ে শুধু কোরআন-হাদীসের কথা বলে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যাকে ইসলামের

মাপকাঠি বানিয়েছে। আবার কেউ উল্লিখিত প্রত্যেক স্তরকে মানার নাম করে এমন কিছু আমল ও আকীদা উম্মতের মধ্যে প্রচার করেছে, যা ওই তিন যুগের কোথাও ছিল না। এসব বাস্তবায়নে কোরআন-হাদীসেরও এমন অপব্যাখ্যা করেছে, যা ওই তিন স্তরের ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

তাই আমাদের ইসলামের যেকোনো আকীদা-আমল বা কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হলে ওই ধারাবাহিকতাকে মাপকাঠি বানিয়ে যাচাই-বাছাই করে করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের মূলধারায় অটুট থাকতে।

একনজরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাসমূহ

(১) إن الله واحد لا شريك له
আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। (আক্বীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২) قديم لذاته وصفاته قديمة
আল্লাহর সত্ত্বা অনাদি, তাঁর গুণাবলিও অনাদি। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৩) كل ما سواه حادث
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব কিছু সৃষ্ট।(শরহে আক্বায়েদে নাসাফিয়া)

(৪) لا يحيطه العقل ولا تدركه الأبصار
বিবেক ও দৃষ্টশক্তি আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে অক্ষম। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫) صمد لا غنى عنه
আল্লাহ তা'আলা কারোর মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬) لا إله إلا هو
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৭) حي لا يموت
আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৮) لايساويه أحد
আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কেউ নেই। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৯) لايشبهه شيء
কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্য নেই। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১০) يعلم ما ظهر وما بطن
আল্লাহ তা'আলা জাহের-বাতেন সব কিছু জানেন। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১১) بصير لا يغيب عن بصره شيء
আল্লাহ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা। কোনো কিছু তার দৃষ্টির অন্তরালে নয়। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১২) يسمع الخفى والجهر
আল্লাহ তা'আলা মৃদু ও উচ্চ সব শব্দ শ্রবণ করেন। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১৩) لايكون الا ما يريد
আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)।

(১৪) قدير لا يخرج عن قدرته شيء
আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। কোনো কিছু তাঁর শক্তির বহির্ভূত নয়। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১৫) لا يعلم الغيب إلا الله حتى الأنبياء والأولياء
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, এমনকি নবীগণও নয়, ওলীগণও নয়। (শরহে আক্বাইদ)

(১৬) لا حاضر ولا ناظر إلا هو حتى الأنبياء والأولياء
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ হাজের-নাজের (সর্বত্র উপস্থিত ও দর্শক) নয়। এমনকি নবীগণও নয়, ওলীগণও নয়। (বাদাইউল কালাম ফী আক্বাইদে ইসলাম)

(১৭) ليس له ولد ولا صاحبة
আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তানও নেই, স্ত্রীও নেই। (সূরায়ে জ্বিন আয়াত নং-৩) (২৯ পারা)

(১৮) الله خالق كل شيء
আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর স্রষ্টা। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(১৯) ورازق بقدر كل شيء
আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর (প্রাণীর) পরিমাণমতো রুজিদাতা। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২০) لاحياة ولا موت إلا بأمره
আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত না জীবন হতে পারে, না মৃত্যু। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২১) هو الشافي للأمراض والقاضى للحاجات
আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তিনিই সমস্ত প্রয়োজন পূরণকারী। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২২) السجدة والنذر لغير الله كفر
গায়রুল্লাহকে সিজদা করা, গায়রুল্লাহর নামে মানত করা কুফুরী। (সূরায়ে-হা-মীম সিজদা, আয়াত নং-৩৫, সূরায়ে-মাইদাহ, আয়াত নং-৩)

(২৩) الاستمداد من أهل القبور شرك
মৃতদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। (বাদাইউল কালাম)

(২৪) التقدير بخيره وشره من الله تعالى
ভালো-মন্দ সব কিছুর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২৫) نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين
আমরা সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি। (শরহে আক্বাইদ)

(২৬) نعتقد بعصمة الأنبياء كلهم
আমরা সমস্ত নবীকে নিষ্পাপ বিশ্বাস করি। (শরহে আক্বাইদ)

(২৭) نبينا محمد ﷺ عبد الله ورسوله
আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২৮) هو المبعوث إلى كافة الإنس والجن
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত মানুষ ও জ্বিনের প্রতি প্রেরিত। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(২৯) هو سيد المرسلين وخاتم النبيين
তিনি সকল রাসূলের সর্দার ও শেষ নবী। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৩০) معراج النبى ﷺ بجسده الشريف فى اليقظة حق
নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে যাওয়া সত্য। (শরহে আক্বাইদ)

(৩১) لا نبى بعده لا أصلى ولا ظلي
তাঁর পর আর কোনো নবীই নেই। মূল নবীও নেই, ছায়া নবীও নেই। (বাদাইউল কালাম)

(৩২) مدعى النبوة بعده وتابعه كافر
তাঁর পরে নবুওয়াতের দাবিদার ও তার অনুসারী সকলেই কাফের। (বাদাইউল কালাম)

(৩৩) حياة عيسى عليه السلام ورفعه حيا إلى السماء حق
হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা এবং তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া সত্য। (সূরায়ে নিসা, আয়াত নং-১৫৮)

(৩৪) ينزل النبي عيسى عليه السلام قبل القيامة متبعا لشريعة نبينا ﷺ
হযরত ঈসা (আ.) আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তের অনুসারী হয়ে কিয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। (শরহে আক্বাইদ)।

(৩৫) القائل بالابنية والتثليث كافر
হযরত ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে পুত্রবাদ ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী কাফের। (সূরায়ে মাইদাহ, আয়াত নং-৭৩, সূরায়ে আল ইমরান, আয়াত নং-৪৯)

(৩৬) رد النصوص وإهانة النبي ﷺ والاستهزاء بالشرع كفر.
কোরআন ও হাদীস শরীফকে অস্বীকার করা, নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা, শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফুরী। (বাদাইউল কালাম, শরহে আক্বাইদ)

(৩৭) معجزات الأنبياء حق
নবীগণের মু'জিযা সত্য। (শরহে আক্বাইদ)

(৩৮) الأنبياء احياء في قبورهم
নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত। (মুসনাদে আবি ইয়ালা)

(৩৯) الصحابة خيار الأمة
সাহাবায়ে কেরাম উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (শরহে আক্বাইদ)

(৪০) نعترف بعدالة الصحابة كلهم
আমরা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে ন্যায়পরায়ণ স্বীকার করি। (শরহে আক্বাইদ)

(৪১) نشهد أنهم مرضيون عند الله ومبشرون بالجنة
আমরা সাক্ষ্য দেই, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বান্দা, তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। (সূরায়ে তাওবা, আয়াত নং-১০০)

(৪২) حب الصحابة من الإيمان
সাহাবায়ে কেরামের মোহাব্বত ঈমানের অংশ। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৪৩) بغض الصحابة وطعنهم نفاق
সাহাবায়ে কেরামের সাথে দুশমনী রাখা, তাদেরকে দোষারোপ করা মুনাফেকী। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৪৪) فضل الخلفاء الراشدين على ترتيب خلافتهم
খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা তাদের খিলাফতের ধারাবাহিকতা হিসেবে নির্ধারিত। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৪৫) الصحابة مصيبون فى مشاجراتهم
সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের যুদ্ধে ও মতবিরোধে সত্যের ওপর ছিলেন। (শরহে আক্বাইদ)

(৪৬) الأولياء مقربون عند الله
ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বান্দা। (সূরায়ে ইউনুস, আয়াত নং-৬২)

(৪৭) وهم دون الأنبياء والصحابة
তাঁরা মর্যাদায় নবীগণ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিচে। (বাদাইউলকালাম)

(৪৮) كرامات الأولياء حق
ওলীগণের কারামত সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৪৯) احترام السلف والتقليد بمذاهب الأئمة حتم لازم.
পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং চার ইমামের যে কারো তাক্বলীদ করা আবশ্যক। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫০) نؤمن بجميع ملائكة الله
আমরা আল্লাহ তা'আলার সকল ফেরেশতার ওপর ঈমান রাখি। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫১) نؤمن بجميع الكتب المنزلة من الله تعالى
আমরা আল্লাহ তা'আলার নাজিলকৃত সমস্ত কিতাবের ওপর ঈমান রাখি। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫২) نؤمن بأن القرآن كلام الله
আমরা ঈমান রাখি যে কোরআনে কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫৩) والكتب كلها منسوخة بعد القرآن
কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার পর পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। (শরহে আক্বাইদ)

(৫৪) خلافة المهدى عليه السلام فى آخر الزمان حق
শেষ যমানায় ইমাম মাহদী (আ.)-এর খেলাফত সত্য। (মিশকাত শরীফ)

(৫৫) خروج الدجال ويأجوج ومأجوج حق
দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ প্রকাশ পাওয়া সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫৬) طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة حق
পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং এক ধরনের প্রাণীর বের হওয়া সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫৭) وأشراط الساعة الأخرى ونفخ الصور حق
কিয়ামতের অন্যান্য নির্দেশনাবলি এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া সত্য। (সহীহ বোখারী)

(৫৮) سؤال منكر ونكير وعذاب القبر وتنعيمه حق.
মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন এবং কবরের আযাব সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৫৯) البعث بعد الموت والحشر حق.
মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়া এবং হাশর সংঘটিত হওয়া সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬০) الحوض والشفاعة حق
হাউজে কাউসার এবং সুপারিশ সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬১) وزن الأعمال والحساب والكتاب حق
আমলসমূহের ওজন করা এবং হিসাব-নিকাশ সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬২) الصراط والجنة والنار حق
পুলসিরাত, জান্নাত ও দোযখ সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৩) رؤية الله تعالى في الآخرة حق
আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দিদার বা সাক্ষাৎ সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৪) خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار حق
মুমিনদের সর্বদা জান্নাতে এবং কাফেরদের সর্বদা জাহান্নামে থাকা সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৫) الفاسق لا يكفر ولا يخلد فى النار أبدا
ফাসেককে কাফের বলা যাবে না, সে জাহান্নামে সর্বদা থাকবে না। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৬) عرش الرحمن وكرسيه أعظم المخلوقات
আল্লাহ তা'আলার আরশ ও সিংহাসন সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৭) اللوح والقلم والميثاق حق
লাওহে মাহফুজ, কলম ও রূহের জগতের অঙ্গীকার সত্য। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৮) الدين عند الله الإسلام
ইসলামই আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দ্বীন। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৬৯) لانجاة عن النار إلا بالإسلام
ইসলাম ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। (আকীদাতুত্ ত্বাহাবী)

(৭০) نصب الإمام لتنفيذ الإسلام لازم
শরীয়তের বিধান চালু করার জন্য আমীর নিযুক্ত করা অপরিহার্য। (শরহে আক্বাইদ)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)